যা দেখেছি তাই

চিরঞ্জীব সেন

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৮ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪
ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
সোমা প্রিণ্টার্স
৩৬ এন রোড
হাওড়া-৮।

যা দেখেছি তাই ১১
বুমেরাং ৪১
ভোলা কয়ালের হাট ৬৪
জীবন দিয়ে জানা ৮২
বিবেকের বলি ১০৬
জেনেও যা জানে না ১৩২

অলীক দেশ ও অলীক চরিত্র প্রধানত কল্পনার রাজ্যেই বিচরণ করে। কিন্তু বাস্তবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কল্পনা সম্ভব নয়। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে অলীক দেশের কাল্পনিক চরিত্রের সঙ্গে বাস্তবের কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সে মিল সম্পূর্ণই আকস্মিক ও অনিচ্ছাকৃত।

আমার এই গল্পগুলির বর্ণনাস্থল, তার পটভূমি এবং সমস্ত চরিত্র ও ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে কোন চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে বাস্তবক্ষেত্রে যদি সামান্যতম মিলও থেকে থাকে তা হলে তা নিছকই অনিচ্ছাকৃত। কোন দেশ কাল বা পাত্রের প্রতি কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

—লেখক

যা দেখেছি তাই

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে বিস্তীর্ণ কান্তার—তারপর যে সুন্দর দেশটি তার নাম অমরাবতী। তিনদিকে অভ্রভেদী পর্বতমালা আর একদিকে সুনীল জলধি। মাঝখানে ছোট্ট রাজ্য অমরাবতী। দেশটি ছোট হলেও তার খুব নাম। তার চেয়ে তার নেতার নাম আরও বেশি।

চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি আমার ভাল জানা নেই। যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন—'মানুষ নাকি ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। জীবজগতের ক্রমবিবর্তনের ফলেই মানুষের নাকি সৃষ্টি।' সেই সৃষ্ট মানুষ আবার নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে নিজের চেষ্টায় ধাপে ধাপে উন্নতির বিভিন্ন স্তরে পেঁছে যাচ্ছে। মানবসমাজের সেই বিরতিবিহীন ক্রমবিকাশের ফলে যে রাজ্যের উৎপত্তি সেখানে ক্রমে ক্রমে এল সাম্রাজ্যবাদ, সমাজবাদ, এল সাম্যবাদ। সেই বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী হলেন অমরাবতীর জনবরেণ্য নেতা। তিনি ঈশ্বর মানেন না। তিনি হলেন সাম্যবাদের ধারক ও বাহক। তাঁর সাম্যবাদের লাল আলোকচ্ছটায় অমরাবতী আজ আলোকিত। তবে তিনি এখনও তাঁর কাছাকাছি দেশগুলিতে সেই সাম্যবাদের আলোক সংকেত পেঁছে দিতে পারেন নি। কিন্তু তার জন্য চেষ্টার বিরাম নেই। জগৎ রঙ্গমঞ্চে সাম্যবাদ শেষ দৃশ্যে এসে পেঁছালেও তাঁর ধারণা সাম্যবাদের বিজয় অভিযান তাঁর দেশ থেকেই নতুন করে আবার শুরু হবে। অবশ্য সে অভিযান এখনও শুরু হয় নি—নিজের দেশ সামলাতেই তাঁরা এখন ব্যস্ত। তবু নেতার গুণে সকলে তাঁদেরকে মান্য করে। নেতার খুব দাপট। এ দেশটি ছোট হলেও সকলেই এর দিকে তাকিয়ে আছে। কোথায় কোন্ রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিল, কার রাজ্যে কে বিদ্রোহ করল, বিচ্ছিন্নতাবাদ কোথায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—অমনি ছোট্ট দেশ অমরাবতীর

নেতার ডাক পড়ল। তিনি এসে মুশকিল-আসান করে দিলেন। তাই প্রায়ই তাঁকে হিল্লী-দিল্লী করে বেড়াতে হয়।

কিন্তু এমন যে রামরাজ্য সেখানেও তো কুচক্রীর অভাব ছিল না। সতী-সাধ্বী সীতার চরিত্র নিয়েও সেখানে নানা ধরনের সমালোচনা হয়েছিল। এ রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও কুচক্রীর দল নানা সমালোচনা শুরু করল। তারা কোমর বেঁধে প্রচারে নেমে পড়ল—'সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থাই যখন, তখন নেতার আবার এত রাজকীয় সুখভোগ কেন?'

কুচক্রীদের মুখে ছাই! সবাই কি আর রামচন্দ্র যে, অভিযোগ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্যে প্রিয়তমা সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দেবেন? তাই নেতা চুপচাপ।

কিন্তু তাঁর সাকরেদরা হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'রাজকীয় সুখভোগ কোথায়? নেতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এটুকু তো নিতান্ত প্রয়োজন। তিনি তো সর্বহারা জনগণের সর্বত্যাগী নেতা। দেশের স্বার্থে যাঁর নিবেদিতপ্রাণ তাঁর আবার রাজকীয় সুখভোগ কোথায়! এটা একটা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।'

আর একদল অন্য দিকে গেল। তারা বলল—'বুঝলাম তিনি সর্বত্যাগী নেতা। কিন্তু তাঁর ঘরেই যে কোটিপতির বাস। তাঁর প্রতিটি আত্মীয়-স্বজন যে বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় দোদুল্যমান—তার বেলায়?'

সাকরেদরা সেখানেও সোচ্চার। তাদের বক্তব্য—'নিজ নিজ সৎ প্রচেষ্টায় তাঁরা প্রতিষ্ঠিত। তোমার আমার তাতে এত চোখ টাটানি কেন?' কুচক্রীরা দলে কম। তাই তাদের মুখ চুন।

আমি শ্রীমান গবুচন্দ্র। ভিন্ রাজ্যে আমার বাস। একবার ঠিক করলাম যাব সেই সোনার দেশে—অমর-বাঞ্ছিত অমরাবতীতে। যে দেশের নেতার এত নাম সে দেশে না জানি আরো কত সুখ। তবে আমি কিন্তু গবুচন্দ্র মন্ত্রী হয়ে হবুচন্দ্র রাজার দেশে যাচ্ছি না। আমি অতি ছাপোষা মানুষ। মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতাও নেই আর

ইচ্ছাও নেই। তবে আমার বাবা-মা বোধহয় আমাকে নামটা দিয়ে একেবারে নিরাশ হন নি। কারণ একবার বাবার মুখেই শুনেছিলাম হক সাহেব তখন আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী। কথাবার্তা বাঙাল-বাঙাল। চাল-চলনও তাই। গিয়েছিলেন একবার গ্রামের বাড়িতে। সময় পেলে প্রায়ই যেতেন। এখনকার প্রধানমন্ত্রীদের মতো যখন-তখন লণ্ডন-নিউইয়র্ক-মস্কো-পিকিং করে বেড়াতেন না। হয়তো প্রয়োজনও ছিল না।

গ্রামের ছেলে গ্রামে এসেছেন। সবার জন্য অবারিত দ্বার। অনুমোদন লাভ করে দেহরক্ষী—পি. এস. বা পুলিশের বেড়াজাল ভেদ করে সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল না। যে-সে যখন-তখন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারত।

জয়নাল চাচা হক সাহেবের প্রতিবেশী। একদিন সকালবেলা হক সাহেব খেজুরের ঝোলাগুড় দিয়ে মুড়ি মেখে খাচ্ছেন। সেই সময় জয়নাল চাচা এসে হাজির। তাঁকে দেখে হক সাহেব সোৎসাহে বলে উঠলেন—'আরে আও-আও জয়নাল! কি সংবাদ কও।'

জয়নাল চাচা পাশের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললেন—'আর কি কমু হক সাহেব! বড় কষ্টে আছি। বড় ছেইলাডার একটা চাকরি-বাকরি না কইর‍্যা দিলে আর যে চলে না।'

হক সাহেব একটু হাসলেন। তারপর জয়নাল চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন—'ঝোলাগুড় দিয়া একটু মুড়ি খাইবা নাকি?'

জয়নাল চাচা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—'আরে না-না, আপনার বাড়ির মুড়ি খাইবার লাইগ্যা কি আর কইতে হইবো। ওতো যহোন তহোন খাইতে পারি। আপনে খান।'

হক সাহেব ঝোলাগুড় মাখা এক চামচ মুড়ি মুখে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন—'তা তোমার পোলা কদ্দুর পড়াশুনা করছে?'

জয়নাল চাচা হক সাহেবের কথায় বিগলিত হয়ে জানালেন—'ল্যাহা-পড়া বেশিদুর করাইতে পারি নাই। বিত্তি পরীক্ষাটা (ক্লাস ফোর) কোদালধোয়া ইস্কুল থিকা দেওয়াইছিলাম। তারপর

আর পড়াইতে পারি নাই।'

জয়নাল চাচার কথায় হক সাহেবকে একটু চিন্তান্বিত দেখা গেল। একটু ভেবে বললেন—'ঠিক আছে জয়নাল, আমি দ্যাখ্‌ম কী করতে পারি।' তারপর নিজে নিজেই উচ্চারণ করলেন—'যা বিদ্যা তাতে তো মন্ত্রিত্ব ছাড়া আর কিছু দেওয়া যায় না।'

জয়নাল চাচা সেদিন হক সাহেবের সেই স্বগতোক্তিকে স্বীকারোক্তি বলে মনে করেছিলেন কিনা জানি না। আর তাঁর ছেলেকে পরবর্তীকালে কোন মন্ত্রিত্বের পদ দেওয়া হয়েছিল কিনা সে সংবাদও আমার জানা ছিল না। তবে জয়নাল চাচার মুখে হক সাহেবের সেই আশ্বাসবাণী শুনে আমার বাবাও হয়তো আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেই রকম একটা আশার দোলায় দুলেছিলেন। কারণ বাল্যকালে আমার উর্বর মস্তিষ্ক আর মেধার পরিচয় পেয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, অন্য কোন চাকরি আমার না জুটলেও একটা মন্ত্রিত্ব হয়তো আমি পেয়ে যাব। তাই 'গবুচন্দ্র' এই নামটির সঙ্গে মন্ত্রিত্বের একটু গন্ধ আছে বলেই তিনি আমার এই সুন্দর নামকরণটি করেছিলেন। তাঁর আদরের শ্রীমান গবুচন্দ্র হয়তো একদিন রাজা হবুচন্দ্রের মন্ত্রী হয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করবে। এই ধারণা নিয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর বাঞ্ছিতধামে চলে গেলেন।

এ হেন গবুচন্দ্র আমি একদিন তল্পিতল্পা বেঁধে সেই 'ধন্যি রাজার' দেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সেই তেপান্তরের মাঠ আর কত কান্তারভূমি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত এসে সেই বাঞ্ছিত দেশের দোরগোড়ায় উপস্থিত হলাম।

আমি ভিন্ দেশের নাগরিক। পাশপোর্ট আমার করাই ছিল। আমার দেশের সীমানা পেরিয়ে এসেছি, ওঁদের রাজ্যে পা দিতেই হৈ-হৈ পড়ে গেল। একদল লোক প্রায় চ্যাংদোলা করে কাস্টমস্ অফিসে নিয়ে এল। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। আমি সাদা-মাটা লোক। পরে অবশ্য বুঝলাম। লোকগুলো ভেতরে চলে গেল।

একটু পরে একজন ফুল ইউনিফর্মপরা পুলিশ ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। পুলিশটি আমাকে একটা বেঞ্চে বসতে বলল। আমি বসলাম। প্রথমে সে আমার ভিসাটা পরীক্ষা করল। তারপর হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। আমি শ্রীমান গবুচন্দ্র গোবর-গণেশের ন্যায় বসে আছি, হঠাৎ পুলিশটি আমাকে জিজ্ঞেস করল—'এসব ব্যবসা কতদিন ধরে করছেন? এর আগে তো এদিকে কোনদিন দেখিনি আপনাকে?'

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। কী বলতে চায় লোকটা? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে ধমকে উঠল—'কি? জবাব দিচ্ছেন না যে?'

তারপর নিজেই উঠে গেল। ভেতর থেকে কতকগুলো চোরাই মালের স্যাম্পেল এনে টেবিলে রাখল। চেয়ারে বসতে বসতে সে জানাল—'এই ধরনের বেশ কিছু অবৈধ মাল আপনার কাছে নাকি পাওয়া গেছে। আজকের আপনিই একমাত্র পাশপোর্টধারী। আমার লোকেরা আপনার কাছ থেকেই এ ধরনের মাল পেয়েছে।'

শুনে আমার বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে এল। অতি কষ্টে তাকে বোঝাতে চাইলাম—'এ ধরনের অন্যায় কাজ আমি করিনি। আপনাদের এই সুন্দর দেশের সুনাম ও সুখ্যাতি শুনে আমি দেখতে এসেছি।'

কিন্তু সে কিছুই শুনতে চাইল না। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। সে আমাকে জানাল—'আমার কিছু করার নেই। যাঁরা আপনাকে ধরেছে তাঁদের মুখ বন্ধ করতে পারলে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি। আর তা না হলে এখানকার শ্রীঘরের লপসি খেয়ে আপনাকে কয়েকটা মাস কাটিয়ে যেতে হবে। আমি আইনের দাস, এর বাইরে আমার কিছু করার নেই।'

সাম্যবাদী সরকারের শান্তিরক্ষকের মুখে এমন সুন্দর আইনের দোহাই শুনে আমার তো মাথায় হাত। কিন্তু কী আর করি? 'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।' তার প্রথম প্রস্তাবেই

রাজী হয়ে গেলাম। বেশ কিছু মোটা টাকা দক্ষিণা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলাম। ওরাই আমাকে ওদের গাড়িতে করে নিকটবর্তী একটা বেশ বড় রেল স্টেশনে পেঁছে দিয়ে গেল।

সেটা একটা জংশন স্টেশন। স্টেশনে পেঁছেই শুনতে পেলাম মাইকে ঘোষিত হচ্ছে—'ফাইভ আপ বৈতরণী এক্সপ্রেস সাতঘণ্টা দেরিতে চলছে। সেভেন ডাউন মহামায়া মেল দশ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট বাদে পেঁছিবে। মহাকাল এক্সপ্রেস সাড়ে তিনঘণ্টা লেটে সুপ্তিগ্রাম থেকে ছেড়েছে। আশা করা যাচ্ছে দুপুর বারোটা নাগাদ এখানে পেঁছিবে'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি বুকিং কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়ালাম। যাব অমরাবতীর রাজধানী কনকপুরে। এই স্টেশন থেকেই আমার ট্রেন। বিকেল চারটে পঞ্চাশে। হাতে এখনও অনেক সময়। এ তো আর আমার দেশ নয় যে, দূর পাল্লার টিকিটের মোটা অংশ বেনামে ব্ল্যাকে বিক্রি হয়ে যাবে। আমি ধীর পদক্ষেপে টিকিট কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। বুকিং ক্লার্কের দিকে রিজার্ভেশন শিলপটা এগিয়ে দিতেই সে একবার শিলপটার দিকে তাকিয়েই বলল—'কন-ফার্মড টিকিট নেই। ওয়েটিং লিস্টে হবে। একশ পঁচিশ '

আমি কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছি। হঠাৎ দেখি বিশ পঁচিশ বছরের একটি ছেলে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এগিয়ে গেলাম। সে আমাকে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল। প্রথমে বুঝতে পারিনি। নতুন দেশ, কেমন একটু ভয় ভয় করছে। কিন্তু ছেলেটা আমাকে সহজভাবেই জিজ্ঞেস করল—'দাদা, কোথায় যাবেন ?'

ভয়ে ভয়ে আমার গন্তব্যস্থানের কথা জানালাম। ছেলেটা পকেট থেকে এক বাণ্ডিল টিকিট বের করে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করল—'কবে যাবেন ?'

আমি বললাম—'আজই।'

সে একটু গম্ভীর হয়ে বলল—'পঞ্চাশ টাকা এক্সট্রা দিতে হবে। আগামী কালের হলে তিরিশ টাকাতেই হত। যাক, টিকিট ও

রিজার্ভেশন রেডি। টাকা ছাড়ুন। টিকিট দিয়ে দিচ্ছি।'

আমার দেশেও এমন ব্যবস্থা দেখেছি। এখানেও দেখছি তাই। তাহলে এ ব্যাপারে আমরা ভাই-ভাই।

আমাকে যেতেই হবে। কুড়ি টাকা বাঁচাবার জন্যে এখানে পড়ে থেকে কী লাভ। কাউণ্টার থেকে কালকের টিকিটও পাওয়া যাবে না। ছেলেটা আমার হাতে একটা টিকিট ধরিয়ে দিয়ে বলল—'আশি টাকা। আর পঞ্চাশ টাকা এক্সট্রা।' আমি ওকে টাকাটা বুঝিয়ে দিলাম।

ছেলেটা একটা নামের লিস্ট বের করে বলল—'দাদা, এখন থেকে আপনার নাম হল হবিবুল্লা বাখারি।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমি শ্রীমান গবুচন্দ্র অবস্থার বিপাকে পড়ে আজ এই ভিন্ রাজ্যে আলাদা পরিবেশে নিজের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে হবিবুল্লা বাখারি সাজলাম।

কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল—আমার সঙ্গে তো পাশপোর্ট ভিসা রয়েছে। ফটোসহ সেখানে আমি গবুচন্দ্র। তাহলে কী হবে? যদি ধরা পড়ে যাই, আমি মুখ কাঁচুমাচু করে ছেলেটিকে সব বুঝিয়ে বললাম। ও এটাকে একটা সামান্য ব্যাপার বলেই মনে করল। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল—'এই ব্যাপার! ঠিক আছে, আর দশটা টাকা ছাড়ুন। সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

সে আমার কাছ থেকে টিকিট ও আরো দশটা টাকা নিয়ে গট্-গট্ করে টিকিট কাউণ্টারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে এসে বলল—'এই নিন। সব ঠিক আছে। আপনি গবুচন্দ্রই রয়ে গেলেন।' বলেই টিকিটটা আমাকে ফেরত দিল।

পাশেই একজন রেল পুলিশ বেতের লাঠিটা বাঁ হাতের বগলে চেপে বাঁ হাতের তালুতে খৈনি টিপছিল। ছেলেটার একটু কাছে এগিয়ে চুপিচুপি বলল—'রাম রাম বাবু, আজ তো দেখলাম সকাল থেকে বহুত কামালেন।'

ছেলেটা পুলিশটির দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল। বলল—

'হবে, হবে সিপাইজী। আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না?' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'তাহলে আসি, দাদা।' বলেই ছেলেটা বাঁ দিকে বেঁকে অন্য একটা কাউণ্টারের দিকে চলে গেল।

আমি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তারপর ধীর পদক্ষেপে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

কী অপূর্ব এই দেশ। প্রাণ জুড়ানো শীতল হাওয়া। গাছে গাছে পাখির ডাক। জলভরা পুকুর। সুনীল আকাশ। বাঁদিকে দিগন্ত প্রসারিত মায়াময় প্রান্তর, ডানদিকে দূরে ধূসর পাহাড়—সবুজ অরণ্যানী—সব মিলিয়ে যেন সেই অচিন দেশের আকাশে বাতাসে এক স্বপ্নালোকের মাদকতা ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তন্ময় হয়ে প্রকৃতির সেই উজাড় করা সৌন্দর্য চোখ ভরে উপভোগ করলাম।

অমরাবতীর আকাশে সূর্যদেব তখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। আস্তে আস্তে রোদ মরে আসছে, ডানদিকের জঙ্গলের মাথায় রঙিন আলোটুকু ধীরে ধীরে নিবে যাচ্ছে। দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর আর দূরের গাছপালাগুলো যেন একটা অস্পষ্ট ধূসর কুয়াশার আচ্ছাদনের নিচে আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে বসেছে।

আমার ট্রেন বিদ্যাধরী এক্সপ্রেস। ছাড়ার কথা পাঁচটা পঞ্চাশে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ছাড়ল আরও কুড়ি মিনিট পরে। মন্থর গতি। হেলে-দুলে যাত্রা শুরু করল কনকপুরের উদ্দেশ্যে। কামরা যাত্রীতে ঠাসা। সবাই অপরিচিত। ভাগ্যগুণে জানলার পাশেই আমার সিট। আমি আমার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে আছি। আমার পাশের সিটটা খালি। আমার জানলার পাশে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একজন যুবক একজন যুবতীর সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলছিল। বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে যুবক ছেলেটা গাড়ির হাতল ধরে পাদানিতে উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছিল, আর হাতের রুমাল নেড়ে ছেলেটাকে বিদায় জানাচ্ছিল। তারপর একসময় গাড়ি প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গেলে সে

এসে আমার পাশের খালি সিটটাতে বসল। আমি জানলার দিকে একটু সরে বসলাম।

আমি এখানে আগন্তুক—বিদেশী। নতুন পরিবেশ। কারো সঙ্গে আলাপ নেই—কাউকে চিনি না। কী আর করি। তাই খোলা জানলা পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে নৈসর্গিক শোভা দেখতে লাগলাম। ততক্ষণে গাড়ি বেশ স্পীড নিয়েছে। বাইরের ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা যেন গাড়ির গতির উল্টো দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে। হঠাৎ যুবকটি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—'আপনি কোথায় যাবেন?'

হঠাৎ প্রশ্নে ওর দিকে তাকালাম। একটু ইতস্তত করে বললাম—'আপাতত যাচ্ছি কনকপুরে। সেখান থেকে আরো দু'একটা জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে।' তারপর একটু নড়ে-চড়ে বসে আমিও ওকে জিজ্ঞেস করলাম—'আপনি কোথায় যাবেন?'

ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর চোখে-মুখে কেমন যেন একটা হতাশার ভাব। আমার প্রশ্নের জবাবে সে খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—'কনকপুর।'

মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করার মতো বিচারবুদ্ধি আমার নেই। ওর এই সংক্ষিপ্ত জবাবের তত্ত্বকাহিনীটিও আমার কাছে অজানা। তাই অতি স্বাভাবিক কারণেই আমি অতি সহজভাবেই ওকে বললাম—'তা হলে তো ভালই হল। একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। আমি পরদেশী—এখানকার কোন কিছুর সঙ্গেই আমি পরিচিত নই।'

যুবকটির সঙ্গে বেশ জমে গেলাম। আমারই বয়সী। বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠল, বন্ধুত্বও। আমার দেশ সম্বন্ধে তার ভীষণ কৌতূহল—আমারও যেমন তার দেশ সম্বন্ধে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অনাচার ইত্যাদি নানা বিষয়ে দুজনের অনেক কথাবার্তা হল। একসময়ে কনকপুর যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম।

সে একটু হেসে বলল—'নিছক ভাগ্য-পরীক্ষা বলতে পারেন।

শুধু আমার নয়, এর সঙ্গে আর একজনের ভাগ্যও জড়িয়ে আছে।'

আমি তার কথার অর্থ না বুঝতে পেরে তার মুখের দিকে তাকালাম।

'বুঝতে পারলেন না তো?' বলেই সে হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল—'আপনার জানলার পাশে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম—নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন?'

আমি একটু চিন্তার ভান করে বললাম—'কই, না তো?'

সে আমার এই স্বেচ্ছাকৃত অস্বীকৃতি বুঝতে পেরে একটু রসিকতার সুরে বলল—'আরে রাখুন তো মশাই! আপনি যে দেশেরই লোক হোন না কেন—এক জোড়া যুবক-যুবতীকে গভীর আলাপে মত্ত দেখেও সেদিকে আপনার চোখ পড়বে না, এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে বলছেন?'

আমি হেসে বললাম—'আচ্ছা, ঠিক আছে। ধরুন, লক্ষ্য করেছি। তা ব্যাপারটা কী? প্রেম-ট্রেম নয় তো?'

আমার কথাটাকে সে যেন একটু উপভোগ করল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—'ঠিকই ধরেছেন, তবে মিলনবিহীন প্রেমই ধরে নিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো শবরীর প্রতীক্ষাই সার হবে—রামচন্দ্রের আগমন আর হবে না।'

তার কথায় বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—'কেন? আমরা তো শুনেছি আপনাদের নেতা অমরাবতীকে রামরাজ্যে পরিণত করেছেন। সেখানে তো কারও আশা অ-পূর্ণ থাকার কথা নয়?'

আমার কথায় সে সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল—'কেন হবে না, তা শুনুন। পাঁচ বছর হল এম. এসসি পাশ করেছি। তখন থেকে বেকার। একটা চাকরির জন্যে রাস্তায় রাস্তায় অফিসে অফিসে হন্যে হয়ে ঘুরেছি। যেখানে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছি সেখানেই শুধু আশ্বাস আর গালভরা উপদেশ। কিন্তু কেউ একটা অতি সাধারণ চাকরি দিয়েও সাহায্য করতে পারেনি। কারণ আমার কাছে

কোন রুলিং পার্টির কোন নেতার সুপারিশ-পত্র ছিল না। অথচ আমার বন্ধুদের অনেকেই যারা ক্লাসে গ্রেস মার্ক ছাড়া কোনদিন পাশ করতে পারে নি তারা স্রেফ পার্টির সুপারিশ বা দাদা-মামার জোরে ভাল ভাল চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। কারণটা অনুধাবন করলাম। বুঝলাম, আমার এ বিদ্যায় চাকরি হবে না। আমার একটা আলাদা কোয়ালিফিকেশন চাই। আর সেটা হল রুলিং পার্টির তাঁবেদার হয়ে কাজ করে সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের কাছ থেকে যেন-তেন-প্রকারেণ একটা সুপারিশ-পত্র আদায় করা।

আমার এক চাকরিওয়ালা বন্ধু তো বলেই ফেলল—'এভাবে কিছু হবে না। চাকরি যদি চাও তো আমাদের দলে ভিড়ে পড়। দলের হয়ে পোস্টার লাগাও, প্রচারপত্র বিলি কর, পার্টির দেওয়াল লেখনে সাহায্য কর, পথসভায় মিথ্যে পরিসংখ্যান দিয়ে সারগর্ভহীন জ্বালামুখী বক্তৃতা কর। দলের নির্দেশে অন্যকে মারধর কর—পার তো দু-একটা খুন কর—দেখবে তোমার ভবিষ্যৎ খুলে যাবে। তোমার চাকরি অবধারিত।'

সে আরো যেন কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগে আমিই তাকে জিজ্ঞেস করলাম—'আপনার সে বন্ধুর পরামর্শ আপনি কতটা গ্রহণ করতে পেরেছেন?'

আমার প্রশ্নে তাকে একটু উত্তেজিত মনে হল। সে আমাকে একটু রাগত ভাবেই জবাব দিল—'আপনি কী বলছেন মশাই! মুখে যতই বলি না কেন—একটা ট্র্যাডিশনকে বদলে দেওয়া কি এতই সহজ? ভদ্রঘরে জন্মেছি, লেখাপড়া শিখেছি—তা আপনিই বলুন মশাই, কী করে সে সব ভুলে যেয়ে—এই সব নোংরা রাজনীতিকে সাপোর্ট করি? আর শুধু সাপোর্ট করলেই তো হবে না, নিজের বিবেককে পাশে সরিয়ে রেখে প্রত্যক্ষভাবে সেই নোংরামিতে নেমে পড়তে হবে। না মশাই, সব বুঝি—তবু এখনও নিজেকে সেভাবে তৈরি করতে পারিনি, কাজেই সমানে নিষ্ফল ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছি। আর ঐ যে মেয়েটির কথা বললাম, ওর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছি।'

ছেলেটির নাম কলিন। ওর কথার ধরন দেখে আমি হেসে ফেললাম। তারপর একটা গাম্ভীর্যের ভাব এনে বললাম—'দেখুন, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—'স্ত্রী ভাগ্যে ধন'। আপনিও জয় রাম বলে ঝুলে পড়ুন। দেখবেন—চাকরি পেয়ে যাবেন।'

সে আমাকে বাধা দিয়ে বলল—'আজ্ঞে না, স্যার। এটা আপনার দেশ নয়। এখানে 'ধন ভাগ্যে স্ত্রী'। আপনার উপর মা-লক্ষ্মীর কৃপা হোক—দেখবেন স্ত্রীলাভ আপনার হাতের মুঠোয়। আপনি যতই প্রেম করুন না কেন আপনার চাকরিটি চাই। নচেৎ আপনার গলায় কেউই মালা দেবে না। আপনাকে বেশ কিছুদিন খেলিয়ে যখন দেখবে আপনার বেকারত্ব ঘুচছে না, তখনই দেখবেন একদিন টুক্ করে কোন এক চাকুরিওয়ালার গলায় ঝুলে পড়েছে। এই আমার প্রেমিকাও আমাকে খেলাচ্ছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমিও দাদা, নিপুণ খেলোয়াড়ের মতোই খেলে যাচ্ছি, দেখা যাক শবরী প্রতীক্ষা করে কিনা!'

এরপর আরও বেশ কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে গেল। আমরা রাতের খাবার খেয়ে নিজেদের জায়গায় শুয়ে পড়লাম।

সকালের দিকে ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হল। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম ট্রেনটা কখন এসে একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেল। কিন্তু ট্রেনটা নট নড়ন—নট চড়ন। প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু লোক নেমে পড়েছে। অনেকে বলাবলি করছে ট্রেন নাকি আর যাবে না। ট্রেনের সামনে রেল লাইনের ওপর একদল লোক বসে পড়েছে। ট্রেন অবরোধ করা হয়েছে, আর যেতে দেবে না। দেখতে দেখতে ট্রেনের প্রায় সব লোক নেমে পড়ল। ছোট্ট স্টেশন। ট্রেনটার এখানে থামবার কথা নয়। প্ল্যাটফর্মটাও ছোট। ছোট্ট প্লাটফর্মে লোক গিজগিজ করছে। বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে আমিও নেমে পড়লাম। আমার সঙ্গে কলিনও নেমেছে। আমরা ট্রেনের পেছন দিকে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে যেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে আমাদের দিকে

আসছে। লোকটা ট্রেনের যাত্রী কিনা বোঝা গেল না। কাছে আসতেই কলিন তাকে জিজ্ঞেস করল—'কী হয়েছে ভাই? ট্রেন আটক হল কেন?'

লোকটা একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে কী যেন দেখে নিল। তারপর আরো একটু কাছে এসে চুপিচুপি বলল—'আর বলেন কেন মশাই! খুন—যাকে বলে রাজনৈতিক খুন!'

তারপর লোকটা নিজের মনেই বলে চলল—'ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। দেশের যে কী হাল হয়েছে। যত সব চোর বদমাইশ ওয়াগন ব্রেকার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে খুন হবে—আর অমনি রাজনীতির নামাবলী চাপা দিয়ে শহিদ বানিয়ে দেবে। ডেড বডি নিয়ে কাড়া-কাড়ি লেগে যাবে। একদল বলবে আমাদের ক্যাডার, আর একদল বলবে আমাদের সক্রিয় কর্মী, আর তারপরেই রব উঠবে—'শহীদ তোমায় ভুলিনি—ভুলব না!' আর অন্য দল গর্জে উঠবে—'এ খুনের বদলা চাই!' সঙ্গে সঙ্গে দু-দলের লড়াই—অমনি বাস পুড়বে, দোকানপাট লুট হবে, ট্রেন আটক হবে। দুম্-দাম্ আরও দু-একটা লাশ পড়ে যাবে। আমরা স্বাধীন হয়েছি না ছাই হয়েছি! এখন রাজা নেই, বিদেশী শাসক নেই। সে যুগে দেখেছি রাজদ্রোহী হও—জেল হাজত খাটবে। আর এখন? শাসক দলের বিরুদ্ধে কিছু বলবে তো তোমার লাশ পড়ে যাবে। জেল-ফেল একদম ব্যাক-ডেটেড। বিচার এখন নিজেদের হাতে—আর সে বিচার চরম বিচার।' বলতে বলতে লোকটা প্ল্যাটফর্মের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে লাইন পার হয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। লোকটার কথাবার্তা শুনে বুঝলাম সে ট্রেন আটককারীদের সমর্থন করছে না। সমাজবিরোধীদের দলীয় কোন্দলের বলিকে কেন্দ্র করে এভাবে ট্রেন আটক করাটা রাজনৈতিক চমক ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ প্রাণের ভয়ে সে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে পারছে না।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না। ছোট স্টেশন, দোকান-পাট নেই। খাবার-

দাবারও তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। সকালের দিকে যদি বা সামান্য কিছু পাওয়া যাচ্ছিল তার দামও ছিল আকাশ-ছোঁয়া। এক টাকার খাবার আট টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। তারপর নিঃশেষ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো খাবারের জন্য চিৎকার করছে। জল নেই, তেষ্টায় সকলের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা অটল। তাদের দাবি হত্যাকারীকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তা না হলে অবরোধ চলবে।

বেলা বারোটা নাগাদ—পুলিশ এল। নেতাদের সঙ্গে বিস্তর আলোচনা হল। কিন্তু ফল কিছু হল না। ফলে, প্রথমে অনুরোধ। তাতে কাজ না হওয়ায় মৃদু লাঠি চালনা। তারপর আমার দেশেও যা হয়—সেই একই চিত্র। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। পুলিশের হাতে লাঠি। আর অবরোধকারীদের হাতে রেল লাইনের পাথর। পাথরের ঘায়ে একজন পুলিশ আহত হলে গুলি চলল। প্ল্যাটফর্মের যাত্রীরা ভয়ে রেলের কামরায় ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে শুনলাম, বিক্ষোভকারীদের একজন পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছে। তারপর বিক্ষোভকারীর দল অবরোধ তুলে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়ে চলে গেছে। প্রায় দুটো নাগাদ আমাদের ট্রেন আবার চালু হল।

ট্রেন চলেছে পূর্ণ গতিতে। দুজন চুপচাপ বসে আছি। একসময় আমিই প্রথম কথা বললাম। কলিনকে জিজ্ঞেস করলাম—'কনকপুর আর কতদূর? কখন সেখানে পেঁছিবে বলে মনে হয়?'

আমার প্রশ্নে সে একটু মুচকি হাসল। তারপর আমাকেই পাল্টা প্রশ্ন করল—'তার আগে আপনি বলুন, আর কত জায়গায় ট্রেনটা এভাবে আটক হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

আমি তার কথায় একটু ভয় পেয়ে গেলাম, বললাম—'সেকি মশাই? এরকম আটক হওয়ার সম্ভাবনা আরো আছে নাকি?'

সে আমার আতঙ্কিত মুখটা লক্ষ্য করে বলল—'কিছুই বলা যায় না। তবে আর কোন অঘটন না ঘটলে আমরা সাত ঘণ্টা লেট

করে হয়তো রাত দেড়টা নাগাদ পেঁছে যাব।' শুনে তো আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল। একে অপরিচিত জায়গা, তার ওপর আবার গভীর রাত। আমি যেন একটু নার্ভাস ফীল করলাম।

কলিন আমার অবস্থা বুঝতে পারল। আমার আতঙ্কিত মুখের দিকে চেয়ে সে বলল—'রাত দেড়টার কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন যেন! ও কিছু নয়। আপনি একটা ওয়ার্লড ফেমাস স্টেশনে যাচ্ছেন, সেখানে রাত দেড়টা কিছুই নয়। তাছাড়া আমি তো থাকছি আপনার সঙ্গে।'

ওর শেষের কথায় আমি একটু সাহস পেলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সূর্যদেব পশ্চিমাকাশে একটা সোনালী বলের ন্যায় অস্তাচলগামী। প্রায় সাত ঘণ্টা বিশ্রাম করার পর ট্রেনটা এবার তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। নিজের দেশে বসে যে কনকপুরের এত নাম শুনেছি সেই কনকপুরে এই প্রথম যাচ্ছি। অদেখাকে দেখার যেমন একটা আনন্দ আছে তেমনি অচেনা জায়গার অসুবিধাও আছে প্রচুর। তাই কেমন যেন একটা চাপা উল্লাস আর তার সঙ্গে একটা কাল্পনিক আতঙ্ক আমার দেহ ও মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

ইতিমধ্যে ট্রেনের কামরাগুলোতে লাইট জ্বলে উঠেছে কিন্তু আমাদের কামরাটার বেশ কয়েকটা আলো জ্বলছে না কেন? তাকিয়ে দেখলাম আলোর পয়েন্টগুলো বালবশূন্য। কলিনকে বললাম—'কী ব্যাপার? বালব নেই? গাড়ি ছাড়ার আগে এগুলো চেক করা হয় না?'

কলিন গম্ভীরমুখে বলল—'নিশ্চয়ই হয়।' তারপর একটু থেমে খুব আস্তে আস্তে বলল—'আপনার দেশে কী হয় জানিনা। তবে আমাদের দেশে এ চেকিংটা শুধু কাগজে কলমে। সেখানে সবই ঠিক আছে।'

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম—'বালবগুলো সত্যি সত্যি কী হল?'

সে হেসে বলল—'রেল আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। এর প্রতিটি জিনিসে সকলের সমান অধিকার। তাই কেউ হয়তো তার শেয়ারের অংশটা তুলে নিয়ে গেছে। এই আর কি!'

কলিনের বক্তব্য বুঝতে পেরে চুপ করে গেলাম।

এর মধ্যে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। আমার দৃষ্টি জানলার দিকে। বাইরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। দূরে আলো ঝলমল একটা শহর। এর আগে আরো দু-একটা গঞ্জ অতিক্রম করে এসেছি। সেখানেও বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুতের আলো দেখেছি। আমার খুব ভাল লাগল। আমার দেশের লোডশেডিং-এর বহর দেখে দেখে আমার চোখ পচে গেছে।

জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে কলিনকে বললাম—'সত্যিই ভাই, আপনার দেশের সরকারের বাহাদুরি আছে। কী সুন্দর ইলেকট্রিকের বন্দোবস্ত করে রেখেছে। যাবেন একবার আমাদের দেশে। দেখবেন ইলেকট্রিসিটির কী দুরবস্থা। এই আছে, এই নেই। আবার নেই তো নেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেই।'

কলিন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল—'হ্যাঁ, তবে এসব যা দেখছেন সবই হিজ হিজ—হুজ হুজ।'

আমি ওর কথা বুঝতে না পেরে অবাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

সে বলল—'বুঝতে পারলেন না তো! ওগুলো সব নিজেদের ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশে এমনও হয়—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই লোডশেডিং। তাই বড় বড় দোকানদার, পয়সাওয়ালা বাড়ির মালিক—এরা নিজেরাই জেনারেটর কিনে নিজ নিজ আলোর ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আর সরকারের কৃপায় জেনারেটরের ব্যবসাও চলছে খুব। একটা বড় সাইজের জেনারেটর কিনে বাড়ি বাড়ি আলো দিয়ে আমাদের এখানে অনেকেই বেশ কিছু কামিয়ে নিচ্ছে। এই যে আলোর ঝলমলানির কথা বললেন সেটা তারই ফল।'

কলিনের কথা শুনে মনটা দমে গেল। সেই সাত সমুদ্দুর তের নদী আর পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে এ কী দেখতে এলাম অমরাবতীতে! এ দেশের সীমানায় ঢোকা অবধি যা দেখে আসছি তার সবই তো আমার দেশের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু বেরিয়ে যখন পড়েছি তখন কনকপুর পর্যন্ত আমাকে যেতেই হবে। সেখানেই তো অমরাবতীর রাজধানী, তার সাম্যবাদী সরকার। লোকের মুখে মুখে যার এত নাম সেখানে পেঁছিতে পারলে নিশ্চয়ই আশার ঝুলি কিছুটা পূর্ণ হবে।

আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে এমনি সব ভাবছি। কলিন ওদের দেশের কী একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। হঠাৎ ট্রেনটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যেতেই পাশের কম্পার্টমেণ্ট থেকে 'ডাকাত! ডাকাত!' বলে একটা চিৎকার শোনা গেল। আমরা অনেকেই উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের কম্পার্টমেণ্টের মেয়েরাও ভয়ে চিৎকার করে উঠল। গাড়ির বেশ কিছু লোক তখন নিচে নেমে পড়েছে। আমি ও কলিন দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। ট্রেনটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার দু'পাশে খোলা মাঠ। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবল রেল লাইনের পাশে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অসংখ্য জোনাকি মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে।

নিচে নেমে-পড়া লোকগুলোর কাছ থেকে জানা গেল দুজন যুবক আগের স্টেশন থেকে যাত্রী সেজে তাদের কম্পার্টমেণ্টে উঠেছিল। প্রথমে তারা কিছুই বুঝতে পারে নি। তারপর সেই স্টেশন থেকে ছেড়ে ট্রেনটা যখন বেশ কিছুদূর এগিয়ে এল তখন ছদ্মবেশী যাত্রীরা তাদের স্বরূপ ধারণ করল। হাতের রিভলবার উঁচিয়ে ওরা যাত্রীদের কাছ থেকে সোনা-দানা, হাতঘড়ি, টাকা-পয়সা সব কেড়ে নেয়। তারপর এখানে চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে এবং অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গাড়ি থেমে যাওয়ায় এবং চিৎকার চেঁচামেচিতে গাড়ির গার্ডও নেমে আসে, সবকিছু শুনে সে বলল—'এখানে আমার কিছু করার নেই। পরের স্টেশনে চলুন, সেখানে আর. পি. এফ. আছে। তাদের

কাছে ডায়েরি করা হবে।' এ কথা জানিয়ে সে সকলকে গাড়িতে ওঠার নির্দেশ দিয়ে নিজের কামরায় চলে গেল।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। আমরাও আবার এসে নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়লাম।

রাত আড়াইটে নাগাদ আমাদের ট্রেন এসে কনকপুর স্টেশনে পেঁছিল।

আমার ভয় কলিন যদি আমাকে একা ফেলে চলে যায়? তাই ওর মনোভাবটা বোঝার জন্য ওকে বললাম—'এত রাতে শহরে কোন যানবাহন পাওয়া যাবে না। আমাদের বাকি রাতটা ওয়েটিংরুমেই কাটাতে হবে।'

কলিন তার ছোট সুটকেসটা হাতে নিয়ে বলল—'তাই চলুন। আমার আত্মীয়ের বাসা এখান থেকে অনেক দূর। পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। ভোর হোক, তারপর দেখা যাবে।'

দু-জনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। ওয়েটিংরুমে ঢুকে দেখলাম, সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই। ট্রেনের যাত্রীরা প্রায় সবাই মালপত্র নিয়ে বাইরে বসে আছে। ওয়েটিংরুমের বেঞ্চগুলো, এমনকি মেঝের অধিকাংশ জায়গা দখল করে যারা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাদের অনেককেই ট্রেনের যাত্রী বলে মনে হয় না।

আমি কলিনকে জিজ্ঞেস করলাম—'এরা সব কারা? অধিকাংশই তো যাত্রী বলে মনে হচ্ছে না।'

কলিন হাতের সুটকেসটা পায়ের কাছে রেখে বলল—'এরা সব স্টেশনের রেজিস্টার্ড কুলি, আর কিছু তাদের দেশওয়ালী ভাই। ওয়েটিংরুমটা রাত্রিবেলা মোটামুটি ওদের দখলেই থাকে। রাতে ঘুমনো আর ভোরে এর বাথরুম ইউরিনাল ইত্যাদি ব্যবহার করাটা এখন ওদের প্রায় অধিকারে দাঁড়িয়ে গেছে। অবশ্য এর জন্যে ওদের একটা মাসোহারা এখানকার ম্যানেজমেণ্টকে দিতে হয়। সাধারণ যাত্রীরা যাতে শান্তিভঙ্গ করতে না পারে সেজন্যে তারা সবরকম ব্যবস্থাই নিয়ে থাকে।'

আমার দেশের অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমাদের দেশে এমনটা হয় জানতাম। কিন্তু এখানেও তাই। তাহলে আর তফাৎ কোথায়? আমি আর কোন কথা না বলে ওয়েটিংরুমের এক কোণে কোনরকমে একটু জায়গা করে নিয়ে কলিনকে বললাম—'আসুন, এখানে বসেই রাতটা কাটানো যাক।'

দু-জনে বসে আছি। বসে থেকে থেকে পথের ক্লান্তিতে ঝিমুনি এল। কিন্তু মশার দাপটে ঝিমুনি কেটে গেল। কলিনকে বললাম—'আপনি বসুন। আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি।'

বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্লাটফর্মের মুখে নম্বর লেখা। পর পর কুড়িটি প্লাটফর্ম। সবগুলোই প্রায় জনমানবশূন্য। সর্বত্র নিঝুম নিস্তব্ধতা। দু-একটা প্লাটফর্মে ভিখিরির দল কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আমি পায়ে পায়ে শেষ প্লাটফর্মটার দিকে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ থমকে গেলাম। কিছু দূরে এক কোণে অস্পষ্ট আলোকে তিন-চারটে লোক বসে মাটির খোরাই করে মদ খাচ্ছে, আর অশ্লীল ভাষায় কী যেন বলছে। আর একটু এগিয়ে গেলাম। এবার চেহারাগুলো আরও অনেকটা স্পষ্ট হল। লোকগুলোর মাঝখানে যে বসে আছে সে একজন স্ত্রীলোক। প্রায় অর্ধনগ্না। দেহবাস নেই বললেই চলে। সে-ও মদের নেশায় মশগুল। নেশাগ্রস্ত লোকগুলো যথেচ্ছভাবে তাকে উপভোগ করছে। তাতে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে-ও মাঝে মাঝে অশ্রাব্য ভাষায় তাদের সঙ্গে রসিকতা করে চলেছে।

আমি আর এগোতে পারলাম না। সেখান থেকে সোজা ওয়েটিংরুমে চলে গেলাম। যেয়ে দেখি কলিন তেমনি বসে আছে। আমাকে দেখেই বলল—'কোথায় গিয়েছিলেন? নতুন জায়গা। এই বিরাট প্লাটফর্মের নির্জন পরিবেশে এদিক-ওদিক না যাওয়াই ভাল। গভীর রাতে এর আনাচে-কানাচে নানা রকমের অপকর্ম চলে।'

আমি কলিনের কথার কোন জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে তার পাশে এসে বসলাম। কিছুক্ষণ বাদে কলিন এসে ওয়েটিংরুমের

দরজার কাছে দাঁড়াল। আমিও তার পেছনে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে কনকপুরের আকাশে তখন আসন্ন রাত্রিশেষের ইঙ্গিত।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই স্টেশনের বাইরে যানবাহনের যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। কলিন বেরিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত। আমি পরদেশী। এসেছি দেশভ্রমণে। তাই আমার কোন তাড়া নেই।

আমি কলিনকে বললাম—'আপনি বেরিয়ে পড়ুন। আমি আরও পরে যাচ্ছি।' তারপর হেসে বললাম—'মনে রাখবেন—শবরী আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। আমার শুভেচ্ছা রইল। আপনার চাকরি এবার হবেই। আপনাদের মিলনসন্ধ্যায় আমি যেন বাদ না যাই!'

আমার ঠিকানাযুক্ত একটা কার্ড তার হাতে গুঁজে দিলাম। কলিনও এখানকার আত্মীয়ের বাসার ঠিকানা এবং দেশের ঠিকানা লিখে আমায় দিয়ে বলল—'আপনার শুভেচ্ছা আমার চিরদিন মনে থাকবে। যদি সম্ভব হয় আমার এই আত্মীয়ের ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমি পাঁচ-সাত দিন এখানে থাকব।' আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে স্টেশনের গেট পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কলিন চলে যাওয়ার পর বেশ খানিকক্ষণ বাদে আমি শ্রীমান গবুচন্দ্র আমার সামান্য তল্পিতল্পা নিয়ে উঠে পড়লাম। স্টেশনের একপাশে ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিস। আগেই খোঁজ নিয়েছিলাম। ওদের কাছ থেকে একটা ভ্রমণসূচীর গাইড লাইন পাব। তাই প্রথমেই সেখানে চলে এলাম। কিন্তু কাউন্টার ফাঁকা, কোন লোক নেই। ওয়ার্কিং আওয়ারস যা লেখা আছে তাতে আরও আধঘণ্টা আগে থেকে সেখানে লোক থাকার কথা।

হাতের ঘড়িটার দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখলাম, না ঠিকই আছে। এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে পাশের এক বইয়ের স্টল-ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম—'আচ্ছা, বলতে পারেন ট্যুরিস্ট অফিসের লোক কখন আসবে?'

স্টলের বইগুলো ঠিক করতে করতে সে বলল—'ও লোক সরকারি নোকরী করে বাবু। ওরা কি আর হামাদের মতো? ওরা নিজের মর্জিমাফিক আসবে। অপেক্ষা করুন। দেখা হোবে।'

আমি আরও প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। তারপর যিনি এলেন তিনি এসেই প্রথমে হাঁক দিয়ে স্টেশনের ভ্রাম্যমাণ এক চা-ওয়ালাকে চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরালেন।

সিগারেটটায় একটা জোর টান দিয়ে চেয়ারের পেছনে এলিয়ে পড়ে এমন ভাব দেখালেন যেন কাজ করে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

আমি হাবাগবা লোক। এদেশের কার্টসি জ্ঞানটা জানা নেই। একটু ইতস্তত করে ওনাকে গুডমর্নিং জানিয়ে শুধু বলেছি—'স্যার, আমি—'

অমনি তিনি আমাকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন—'দাঁড়ান, মশাই! দেখতে পাচ্ছেন না? সবে তো এলাম!'

আমি আর কোন কথা না বলে একপাশে সরে দাঁড়ালাম। চা এল। তিনি মৌজ করে প্রায় দশ মিনিট ধরে চা খেলেন। তারপর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে আমাকে বললেন—'কী জানতে চান, এবারে বলুন।'

আমি আমার বক্তব্য জানালে তিনি একটা ভ্রমণসঙ্গী আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এতে সব লেখা আছে, পড়ে দেখুন। প্রয়োজন হলে ওটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন।' বলেই তিনি তার ভাঁজ-করা খবরের কাগজটা খুলে পড়তে শুরু করলেন।

আমি একটু সরে এসে তাঁর দেওয়া কাগজটা দু-একবার উল্টে-পাল্টে দেখলাম। তারপর সেটা নিয়ে সেখান থেকে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার কল্পনার কনকপুর। ভোরের সিগ্ধ আলোকে সে উদ্ভাসিত। আকাশচুম্বী বিরাট বিরাট অট্টালিকার ফাঁকে ফাঁকে তখনও ছড়িয়ে আছে আবছা

কুয়াশার ধোঁয়াটে প্রলেপ। আমি এগিয়ে চলেছি শহরের ভেতরে। পায়ে হেঁটেই যাচ্ছি। হেঁটে হেঁটে নতুন শহর দেখার আনন্দ আলাদা। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আমার আক্কেল গুড়ুম। এই কি আমার সেই কল্পনার কনকপুর? এ যে জঞ্জালপুরী! রাস্তার এখানে সেখানে খানা-খন্দ আর আবর্জনার পাহাড়। চারদিকে দুর্গন্ধ। ফুটপাতগুলো হাঁটার অযোগ্য। ময়লা আর আবর্জনায় পূর্ণ। তারই মাঝে কুকুর বেড়ালের ন্যায় ভিখিরির দল গুটিসুটি মেরে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। রাস্তায় যানবাহনগুলো খানা-খন্দ পেরিয়ে নৃত্য করতে করতে এদিক ওদিক এগিয়ে চলেছে। ফুটপাতগুলোর এখানে সেখানে এরই মধ্যে দোকানী পসরা সাজিয়ে বসে পড়েছে। লোকের চলাচলের পথেই উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে। ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। কেউ চা বিক্রি করছে, উনুনে কড়াই চাপিয়ে কেউ কচুরি ভাজছে। কেউ বা জিলিপি ভেজে নোংরা ভাঙা পাত্রে সাজিয়ে রাখছে। চারদিকে মাছি ভন্‌ভন্‌ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও ভিখিরির দল ঝুপড়ি বেঁধে নিজেদের সংসার সাজিয়ে নিয়েছে। সর্বত্র যেন একটা বিশৃঙ্খল নোংরা পরিবেশ।

তারই মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। কিছুদূর যেয়ে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম—'স্যার, আমি বাইরে থেকে আসছি। কয়েকদিন এখানে থাকতে চাই। কাছাকাছি কোন ভাল হোটেল পাব কি?'

তিনি আঙুল দিয়ে দূরে একটা হোটেলের নিশানা বলে দিলেন, আমি আর ঘোরাঘুরি না করে সেই হোটেলেই একটা ঘর বুক করে নিলাম।

হোটেল ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছি। বেলা তখন প্রায় দশটা। রাস্তায় লোকজন গাড়ি-ঘোড়া সব গিজ্‌গিজ্‌ করছে। অফিস টাইম। বাস বাসগুলোতে তিল ধারণের জায়গা নেই। বাদুড়ঝোলা হয়ে যাত্রীরা যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি, দূরে এক চৌরাস্তার মোড়ে যানবাহন-

গুলোকে কে যেন 'তিষ্ঠ!' বলে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কী ব্যাপার? চেয়ে দেখি, একটা পাইলট ভ্যান তার মাথার ওপরের রঙিন আলোটাকে বিচিত্রভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে আসছে। তার পেছনে পেছনে ইয়া বড় বড় তিনটে মোটরবাইকে তিনজন সার্জেণ্ট। মাঝখানে একটা সুদৃশ্য মোটরগাড়ি। তার পেছনে পেছনে আবার তিনটে বিশালকায় মোটরবাইকে তিনজন সার্জেণ্ট তীব্র গতিতে ছুটে আসছে।

ব্যালকনিতে আমার পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—'কোন ভি. আই. পি. যাচ্ছেন বোধ হয়?'

তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, আমাদের প্রধানমন্ত্রী গেলেন তাঁর বুলেটপ্রুফ গাড়িতে। বোধহয় বিমানবন্দরে গেলেন। বাইরে কোথাও যাবেন।'

আমি ভদ্রলোককে আর কিছু বললাম না। শুধু মনে মনে ভাবলাম—ইনিই তাহলে অমরাবতীর সেই জনবরেণ্য নেতা? নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির এ হেন সিকিউরিটির বহর দেখে আমি তো অবাক! সাম্যবাদী সরকারের প্রিয় জননেতার সত্যই বিচিত্র এই পথ পরিক্রমা।

পরের দিন সকালে উঠে তারকব্রহ্মপুর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। হোটেলের ম্যানেজার গত রাত্রেই আমাকে জানিয়েছিলেন সেখানে এক বিরাট মেলা চলছে। জাগ্রত দেবতা। প্রায় এক পক্ষকাল থেকে সেখানে মেলা বসেছে, চলবে আরও বেশ কিছুদিন। বিখ্যাত তীর্থস্থান। আজ দেবতার বাৎসরিক পূজা।

ট্রেনের পথ। লোকাল ট্রেন। তারকব্রহ্মপুর এখান থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটারের পথ।

টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেছি। বেশ কিছু সময় হাতে রেখেই বেরিয়েছি। ট্রেনে বেশ ভিড়। আমার পাশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। তিনিও সেখানে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের ওপর। কথা-বার্তায় মনে হল একটু প্রাচীনপন্থী।

অর্থাৎ, যারা মনে করে—যা নতুন তাই গ্রহণীয় আর যা প্রাচীন তাই বর্জনীয়—তাদের দলের তিনি নন। একটু সমালোচক-সমালোচনার দৃষ্টি দিয়েই তিনি সব কিছু বিচার করেন।

ট্রেন ছাড়ার সময় পেরিয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—'দেখুন তো মশাই, আজকাল যে কী হয়েছে—সিডিউল টাইম কখন পেরিয়ে গেল—অথচ ট্রেন ছাড়ার নাম নেই। আমাদের টাইমে এক মিনিট এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় ছিল না, ট্রেন লেট করে ছাড়লে বা লেটে পেঁছিলে দস্তুরমত এক্সপ্লানেশন দিতে হত।'

আমি তাঁকে বললাম—'এখন অনেক কম্‌প্লিকেসি বেড়ে গেছে। সব সময় সঠিক সময় মেনে চলা সম্ভব না।'

আমার কথায় ভদ্রলোক বেশ চটে গেলেন। একটু উত্তেজিত হয়েই তিনি বললেন—'রাখুন তো মশাই আপনার কম্‌প্লিকেসি। কম্‌-প্লিকেসি যেমন বেড়েছে তেমনি তা দূর করারও নানা রকম ব্যবস্থা রয়েছে। ওসব কিছু নয় মশাই। আসল কথা হল "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।" আমার যা খুশি তাই করব। তোমার অসুবিধা হয় তুমি বুঝবে। এই দেখুন না, এখনই হয়তো মাইকে ঘোষিত হবে অনিবার্য কারণবশত এই ট্রেনটা বাতিল করা হল। কারোর কিছু বলার নেই। খুব সুন্দর এই অনিবার্য শব্দটা। এক কথায় বাজি-মাৎ! কেউ কোনই কারণ জানতে পারল না বুঝতে পারল না—অথচ ট্রেনটা বাতিল হয়ে গেল। দুটো ট্রেনের যাত্রী একটা ট্রেনে গরু ছাগলের ন্যায় বোঝাই হয়ে রওনা হবে। কেউ উঠতে পারবে—কেউ পারবে না। তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না।'

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনছি। হঠাৎ দেখি, একজন রেলওয়ে পুলিস অফিসারের অধীনে প্রায় ডজন খানেক বন্দুকধারী পুলিস আমাদের কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল। কম্পার্টমেন্টে প্রচণ্ড ভিড়। ভেতরে ঢুকতে পারছে না। তাই সেখানে দাঁড়িয়েই পুলিস অফিসারটি মাইক কাঁপানো গলায় বললেন—'আপনারা সকলে

এ কম্পার্টমেণ্ট থেকে নেমে অন্য কামরায় চলে যান। এ কামরাটা খালি করে দিতে হবে।'

পুলিস দেখে বেশ কিছু লোক কামরা থেকে নেমে পড়ল। তাদের নেমে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হল তারা বিনা টিকিটের যাত্রী। ভেতরে যারা বসেছিল তারা অনেকেই নামতে রাজী হল না।

পুলিস অফিসারটি তখন তাঁর দলবল নিয়ে কামরার ভেতর ঢুকে পড়লেন। সকলকে সবিনয়ে বললেন—'আপনারা দয়া করে নেমে যান। কামরাটা খালি করে দিন। আপনাদের এ অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্যে আমরা খুবই দুঃখিত।'

আমার পাশের ভদ্রলোকটি এতক্ষণ ট্রেন না ছাড়ার জন্য এমনিতেই রেগে বসেছিলেন, তার ওপর পুলিস অফিসারটির এই নির্দেশ শুনে ভীষণ চটে গিয়ে বললেন—'মহাশয়ের কাছে এ অসুবিধাটি সৃষ্টি করার কারণটি জানতে পারি কি?'

অফিসারটি তেমনি বিনীত ভাবেই জানালেন—'স্টেশন সুপার কিছুক্ষণ আগে শান্তিভবন অর্থাৎ পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ পেয়েছেন ইমিডিয়েটলি এই ট্রেনের একটি কামরা খালি করে দিতে হবে। তাই রেল কর্তৃপক্ষ ০৭৩৫ এই কামরাটি খালি করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশি আর কিছু আমি আপনাদের জানাতে পারছি না। আমারও এর বাইরে কিছু জানা নেই।'

ভদ্রলোক বললেন—'আমরা জেনুইন টিকিট হোল্ডার। যদি না নামি?'

অফিসারটি একটু ইতস্তত করে বললেন—'আমি বাধ্য হব পুলিস দিয়ে আপনাদের নামিয়ে দিতে। আমার ওপর সে রকমই নির্দেশ আছে।' তারপর একটু থেমে পুনরায় বললেন—'আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা নেমে পড়ুন। আমি আশা করব তেমন অপ্রীতিকর আদেশ দিতে আপনারা আমাকে বাধ্য করবেন না।'

পুলিসের ব্যাটনের চেয়ে তার বাচন-ভাষণ অনেক সময় অনেক বেশি কার্যকরী হয়।

পুলিস অফিসারটির ভদ্রোচিত ব্যবহারে আমরা অনেকেই কামরা ছেড়ে নেমে পড়লাম। দু-চারজন যুবক একটু গাঁইগুঁই করল। কিন্তু প্রায় সবাই নেমে পড়ায় তারাও শেষ পর্যন্ত কামরা ছেড়ে অন্য কামরায় যেয়ে উঠল।

আমার সঙ্গের ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে বললেন—'চলুন, আমরা পরের গাড়িতে যাই। এ গাড়িতে প্রচণ্ড ভিড় হয়ে গেছে। এতটা পথ আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য আপনার তাড়া থাকলে আপনি এই গাড়িতেই যেতে পারেন।' আমি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরের গাড়িতেই যেতে রাজী হলাম।

আমরা দুজনে পরবর্তী ট্রেনের জন্য স্টেশনের একপাশে এসে অপেক্ষা করছি।

ঠিক সেইসময় দেখলাম, একদল পুলিস বেষ্টিত হয়ে আটদশজন সুবেশা মহিলা আমরা যে কামরাটি থেকে নেমেছি সেই কামরায় এসে উঠলেন। পরে জানলাম প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল তিনি তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে ট্রেনে করে তারকব্রহ্মপুর যাবেন ঠাকুরের পুজো দিতে। তাই আমাদের এই হেনস্থা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একথা শুনে ভীষণ চটে গেলেন। বললেন—'এ যদি জানতাম তাহলে কিছুতেই আমি কামরা ছেড়ে নামতাম না। দেশের যে কী হাল হয়েছে তা আর কাকে বোঝাই? এই আমাদের সাম্যবাদ! প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে আমাদের এতগুলো লোককে অসুবিধায় ঠেলে দিল। কিছু বলার উপায় নেই। গেরিলাবাহিনী পেটো হাতে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু বলবেন তো আপনার লাশ পড়ে যাবে। এই জেনারেশনের ছেলে-গুলোও হয়েছে বটে! আর তাদেরই বা দোষ কী? বেকারত্বের জ্বালায় ভুগে ভুগে সেগুলোর মেরুদণ্ডও ভেঙে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে। নেতারা গদিতে

বসে বড় বড় আদর্শের বাণী আওড়াচ্ছেন আর মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে বেকার ছেলেগুলোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। বেকার ছেলেগুলোও সেই প্রলোভনের শিকার হয়ে নিজেদের নৈতিক দায়িত্বের কথা ভুলে গেছে। তারা আজ নিজেদের ভবিষ্যতকে নেতাদের হাতে বিকিয়ে দিয়েছে। ফলে সমাজের সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা। সেই একটা কথা আছে না—এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই—এখন হয়েছে সেই অবস্থা। যে যেখান থেকে যে ভাবে পারছে লুটে নিচ্ছে, আর যাদের সে ক্ষমতা নেই তারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে।'

আমি চুপচাপ ভদ্রলোকের কথা শুনছি আর মনে মনে ভাবছি—ভাগ্যিস্ দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার আজ আর বেঁচে নেই! তা না হলে তিনি তাঁর সেনাপতি সেলুকাসকে নিয়ে এ রাজ্যে এলেও বলতেন—"সত্যি সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ!"

এমনি ভাবছি ঠিক তখনই মাইকে এ্যানাউন্সমেণ্ট হল—'তারকব্রহ্মপুরের পরবর্তী গাড়ি চার নম্বর প্লাটফর্ম থেকে নটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে ছাড়বে।'

ভদ্রলোক এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন—'চলুন, আবার দেখি এটায় কোন মন্ত্রীর শালী বা শাশুড়ী যাবেন কিনা।' বলেই ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

সেদিন সেই জাগ্রত দেবতার পীঠস্থানে পেঁছে ধর্মের নামে যে ব্যভিচার দেখলাম তাতে দেবতা রুষ্ট না হলেও আমার মনে এক বিরাট ক্ষোভের সঞ্চার হল। কোন আইন নেই, কোন শৃঙ্খলা নেই ধর্মান্ধ লোকগুলোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাণ্ডার দল তাদের কাছ থেকে বেআইনীভাবে দেবতার দর্শনী আদায় করে নিচ্ছে। উচ্ছৃঙ্খল জনতার চাপে মেয়েদের শালীনতা বিসদৃশভাবে বিঘ্নিত। দেবস্থানের সেই শান্তসমাহিত পরিবেশ এখানে কোথায়? এ যেন এক বিরাট জনারণ্যে জেহাদ ঘোষণা। আমি নিরুপায় হয়ে

দূরে একস্থানে দাঁড়িয়ে সেই ধস্তাধস্তি প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। আমার সঙ্গের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেই জনস্রোতে কখন যে হারিয়ে গেলেন তাঁকে আর খুঁজে পেলাম না।

তারকব্রহ্মপুর থেকে যখন ফিরলাম রাত তখন নটা। স্টেশন থেকে বেরিয়েছি। বাস ধরে আমার হোটেলে যাব। এত রাত তবু বাসে ভিড়ের কমতি নেই। কোন রকমে ঠেলেঠুলে বাসে উঠলাম। আমার সঙ্গে একটা চামড়ার ব্যাগ। তাতে অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে আমার পাসপোর্টটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম।

হোটেলে পেঁছে ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে দেখি তার তলদেশটা সুনিপুণভাবে ব্লেড দিয়ে কাটা। আমি আঁতকে উঠলাম। পাসপোর্টটা খোয়া যায় নি তো? যা ভেবেছি তাই! ব্যাগটা খুলে দেখি তার মধ্যে কিছুই নেই। ভাগ্যিস্ টাকা-পয়সা ব্যাগের মধ্যে রাখিনি? তাহলে তাও যেত।

আমি আর দেরি না করে সোজা থানায় চলে গেলাম। আমি বিদেশী। পাসপোর্ট চুরি গেছে। আমার ডায়েরী করা দরকার। কিন্তু থানায় যেয়ে আর এক বিপদ। যারা রক্ষক এখানে দেখি তারাই ভক্ষক। থানার ও. সি. আমার সব কথা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর আমাকে বললেন—'আমি কী করে বিশ্বাস করি যে, আপনি পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে আমার দেশে এসেছেন? আমি যদি বলি, আপনি অবৈধভাবে এদেশে প্রবেশ করেছেন? এখন ধরা পড়ায় ভয়ে এক গল্প ফেঁদে এখানে এসেছেন?'

ও. সি.-র কথায় আমি তো হতভম্ব। বুঝলাম, এখানেও একটা কিছু মতলব আছে। প্রথমে যে চেকপোস্ট দিয়ে ঢুকেছি সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়তেই—সেখানে খোঁজ নেওয়ার কথা আর বলতে পারলাম না। কী জানি যদি হিতে বিপরীত কিছু হয়ে যায়। তাই আমি অতি বিনীতভাবে জানালাম—'দেখুন, আমি যা ঘটনা তাই আপনাকে বলেছি। আমি যে হোটেলে আছি সেখানেও আপনি প্রয়োজনবোধে খোঁজ নিতে পারেন।'

অফিসারটি আমার কথায় একটু বাঁকা হাসি হাসলেন। তারপর চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে হাতের কলমটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বললেন—'ওসব হোটেলের কথা মশাই অনেক জানা আছে। টাকা দিলে ওরা দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে পারে। এখন বলুন, আমি আপনার জন্যে এ অবস্থায় কী করতে পারি?' বলেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা ভিতরে চলে গেলেন।

আমি বসে আছি। একজন সিপাই ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, আমার কাছে এসে বলল—'আপনি তো খুবই অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। এভাবে কেউ বিনা পাসপোর্টে আসে?'

আমি তাকে বলতে যাচ্ছিলাম—'বিনা পাসপোর্টে আমি—'

কিন্তু সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—'ওসব কথা আপনার কেউ বিশ্বাস করবে না। বড়বাবু ভীষণ কড়া লোক। তিনি আপনাকে সোজা শ্রীঘরে পাঠিয়ে দেবেন। তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণে যা হবার তাই হবে, সে ভীষণ ঝামেলার ব্যাপার। সে-সব ঝামেলায় না যেযে বরং অন্য কোন একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

আমি তার মুখের দিকে তাকাতেই সে একটু বোকার হাসি হাসল এবং বলল—'মানে, এই বলছিলাম আর কি—ওসব ঝামেলায় গেলে আপনার অনেক টাকা-পয়সা খরচ হবে। হয়রানিও প্রচুর। তার চেয়ে—সব বুঝতেই পারছেন—এখানে যদি কিছু খরচাপাতি করেন—তাহলে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

আমি এদের মতলব বুঝতে পারলাম। তাই, আর ঝামেলার মধ্যে না যেয়ে যস্মিন্ দেশে যদাচার—এই ভেবে সিপাইজীর হাতে একশো টাকার পাঁচখানা নোট গুঁজে দিলাম। মনে হল সিপাইজী খুব খুশি। আমার কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে সে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বলল—'স্যার, মেজবাবুকে ডেকে দেব কি?'

ও. সি. সাহেব ভেতর থেকে বললেন—'দরকার নেই, আমিই আসছি।' তারপরই তিনি বেরিয়ে এসে চেয়ারে বসলেন।

একটু গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললেন—'আপনাকে নিয়ে এখন কী করা যায় বলুন তো? আমি ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু আপনার পাসপোর্ট নেই। এভাবে তো আপনি ঘুরে বেড়াতে পারেন না।' তারপর একটু যেন ভেবে বললেন—'এক কাজ করুন,

আপনি ইমিডিয়েটলি এ দেশ ছেড়ে নিজের দেশে চলে যান। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কাল সকালে এখানে চলে আসুন। আমি লোক দিয়ে আপনাকে বর্ডার পার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।'

এ দেশ দেখার শখ আমার মিটে গেছে। যা দেখেছি তাতেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। আবার কোন নতুন ফ্যাসাদে ফাঁসিয়ে না দেয়, তাই ও. সি.-র প্রস্তাবেই রাজী হয়ে গেলাম।

থানা থেকে বেরিয়ে সোজা হোটেলে চলে এসেছি। মনটা ভারাক্রান্ত। চুরির অভিযোগ জানাতে গিয়ে প্রকারান্তরে নিজেই চোর সেজে চলে এলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলের বিছানায় শুয়ে আছি। একবার এপাশ একবার ওপাশ করছি। ঘুম কিছুতেই আসছে না। কলিনের কথা একবার মনে এল। ওর ইণ্টারভিউ কেমন হল জানবার বড়ই ইচ্ছা ছিল। বেচারার চাকরিটার সঙ্গে ওর জীবনের একটা মিষ্টি মধুর অধ্যায় জড়িয়ে আছে। কালই ওর আত্মীয়ের বাসায় যেয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম। তা আর হল না। কাল সকালেই এদেশ ছাড়তে হবে। নিয়ম ভঙ্গ করাই যেখানে নিয়ম আর আইনের ব্যতিক্রমই যেখানে আইন, সেখানে যে কোন সময়ে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই যঃ পলায়তে সঃ জীবতে।

সকালে উঠেই হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে থানায় এলাম। থানার ও. সি. সেই সিপাইকে ডেকে বললেন—'যাও বাহাদুর, একে সীমানা পার করে দিয়ে এস।'

পুলিস জীপে চড়ে থানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সীমান্তবর্তী পার্বত্য গুপ্তপথে বাহাদুর আমাকে অমরাবতী পার করে দিল।

সীমানা পেরিয়ে শেষবারের মতো একবার অমরাবতীর দিকে তাকালাম। ঐ সেই অমরাবতী—যে ছিল আমার কল্পনার স্বর্গের অমরাবতী—যেখানে কল্পনা করেছি স্বর্গীয় সুখ, অনাবিল আনন্দ আর ন্যায়-নীতি ও সততার এক দৃষ্টান্ত-প্রদানকারী পরিবেশ। কিন্তু কী আমি পেলাম বাস্তবের অমরাবতীর কাছ থেকে? নতুন কী দিতে পেরেছে সে আমাকে? যা দেখেছি তাই ছাড়া আর কিছুই নয়।

* * *

ব্যুমেরাং

পাশাপাশি দুটি গ্রাম—উদয়পুর আর পাহাড়পুর। শহর থেকে দূরে। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুটি গ্রামই গ্রাম-বাংলার আর পাঁচটা গ্রামের চেয়ে উন্নত। আর উন্নত বলেই দুটি গ্রামের মধ্যে রেষারেষি লেগেই আছে। কে কাকে কখন কীভাবে জব্দ করবে তার একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুই গ্রামের মধ্যে লেগেই আছে। তার ওপর দুই গ্রামের দুই পঞ্চায়েতপ্রধান দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোক। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই রেষারেষির কারণটি আরও প্রবল।

একবার ঠিক হল দুগ্রামের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা হবে। কিন্তু সেখানেও এক সমস্যা। কোন্ মাঠে খেলা হবে—পাহাড়পুরের, না উদয়পুরের! উদয়পুর বলল—'আমাদের মাঠে খেলা হবে।' কিন্তু পাহাড়পুর নারাজ। তাদের বক্তব্য—'আমাদের মাঠই বা কম কিসে? সেখানে খেলা হতে বাধা কোথায়?' দুগ্রামের উদ্যোক্তারাই অনড়। শেষ পর্যন্ত দুই গ্রামের পঞ্চায়েতপ্রধানদের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হল। ঠিক হল লটারি করে ঠিক হবে কোন্ মাঠে খেলা হবে।

পাহাড়পুরের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না। পাহাড়পুরের জয় হল। উদয়পুরকে মুখ বুজে তাই মেনে নিতে হল।

পাহাড়পুরের খেলার মাঠ। লোকে লোকারণ্য। দুই গ্রামের লোকেরাই সমান উৎসাহী। নিজেদের খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে উদয়পুরের কয়েক শো লোক মাঠে উপস্থিত। পাহাড়পুরের দর্শক তো আছেই। স্থানীয় এম. এল. এ. ভোলানাথ দত্তও নিমন্ত্রিত। তিনি প্রধান অতিথি।

দৈর্ঘ্যওয়ারী মাঠের মাঝখানে কাপড়ের সামিয়ানা টাঙানো। মাননীয় অতিথিদের বসার জায়গা, সারি সারি বেতের চেয়ার।

সামনের দিকে একটি টেবিল—সুদৃশ্য টেবিল-ক্লথে ঢাকা। টেবিলের মাঝ-বরাবর মাঠের দিকে মুখ করা একটি সুদৃশ্য চেয়ার। টেবিলের ওপরে দুপাশে দুটি কারুকার্যমণ্ডিত ফুলদানিতে রক্তিম গোলাপের তোড়া—মাঝখানে একটি মাইক্রোফোন। মাথা হেঁট করা—যেন সেই সুদৃশ্য চেয়ারের অনাগত অতিথির প্রতি অগ্রিম কুর্নিশ জানিয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়পুর খেলে ভাল। খেলা হবে পাহাড়পুরের মাঠে—কাজেই পাহাড়পুরের কাছে এটা মরণপণ লড়াই। এ লড়াই তাদের কাছে মর্যাদার লড়াই। নিজের মাঠে খেলে হেরে যাওয়া সেকি সহ্য করা যায়? খেলার উদ্যোক্তাদের বক্তব্য—'যে করেই হোক জিততে হবে। জিততে না পারলে খেলা ভণ্ডুল করতে হবে।' তাদের সব ব্যবস্থা পাকা। পচা গুণ্ডাকে হাজির রাখা হয়েছে। তেমন দেখলে সে গোলমাল পাকিয়ে খেলার দফা রফা করে দেবে।

খেলা আরম্ভ হবে সাড়ে চারটায়। মাঠের চারপাশে দর্শক পিল-পিল করছে। বালক-বৃদ্ধ-যুবা সব বয়সের লোকই আছে। তবে যুবকের সংখ্যাই বেশি। খেলার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ বেশি।

বিমল বোস পাহাড়পুরের গ্রামপ্রধান। ভোলাবাবু তাঁর দলেরই এম. এল. এ.। বিমলবাবুর দলের ছেলেরাই খেলা পরিচালনা করছে। তিনি এসেই একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—'ভোলাদা কখন টাইম দিয়েছেন?'

ছেলেটি বিমলবাবুর কাছে এসে বলল—'কাল সন্ধ্যায় ভোলা-বাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সাড়ে চারটের মধ্যেই তিনি এসে যাবেন। আমি অলরেডি বিকাশকে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরা এখনই এসে যাবে।'

গ্রামপ্রধান বিমলবাবু কী যেন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন—'ভোলাদার কাছে আমিই যাব ভেবেছিলাম। হঠাৎ একটা মিটিং-এ এমন আটকে গেলাম—তাড়াহুড়ো করেও চারটের আগে শেষ করা গেল না।'

কথা বলতে বলতেই ইশারায় তিনি ছেলেটিকে আড়ালে ডেকে নিলেন। দেখে মন হল ছেলেটি বিমলবাবুর খুব কাছের লোক। তারপর চুপিচুপি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাদের সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো কমল ?'

ছেলেটির নাম কমল সেন। সে বিমলবাবুর আরও কাছে এসে কানে কানে বলল—'সব ব্যবস্থা পাকা। আপনি কিছু ভাববেন না বিমলদা। পচাকে ঠিক করে রেখেছি। ব্যাটাকে দুপেগ ধরিয়ে দিয়ে পার্টি অফিসে বসিয়ে রেখেছি। ওতেই কাজ হবে। খবর দিলেই অ্যাকশান শুরু করে দেবে।'

ওদের কথার মাঝখানেই একজন চেঁচিয়ে উঠল—'ঐ যে ভোলা-বাবু এসে গেছেন।'

প্রধান তাঁর দলবল আর খেলার উদ্যোক্তাদের নিয়ে এগিয়ে এসে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে এম. এল. এ. সাহেবকে এনে সুদৃশ্য চেয়ারটিতে বসালেন।

ঘড়িতে তখন চারটে বেজে পনের। সঙ্গে সঙ্গে মাইকে ঘোষিত হল—'আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আমাদের প্রধান অতিথি স্থানীয় এম. এল. এ. মাননীয় শ্রীভোলানাথ দত্ত মহাশয় এসে গেছেন। ঠিক চারটে ত্রিশেই খেলা শুরু হবে। আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আমাদের সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করতে সাহায্য করুন।'

উদ্যোক্তাদের একজন এম. এল. এ. সাহেবের অনুমতি নিয়ে দুই দলের খেলোয়াড়দের সংবাদ দিতে গেল। তারা পাশেই ক্লাব ঘরে অপেক্ষা করছিল। কালো-মেরুন আর সাদা-সবুজ জার্সি পরে দু-দলের খেলায়াড়রা বল নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মাঠে ঢুকল। চারদিক থেকে হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা হল। ঠিক সাড়ে চারটেয় খেলা আরম্ভ হল।

খেলার প্রথমার্ধে উদয়পুর দল এক গোলে এগিয়ে রইল। দ্বিতীয়ার্ধের পনের মিনিটের মাথায় তারা আর একটি গোল করে

দু গোলে এগিয়ে রইল। পাহাড়পুর টিমের কর্তাব্যক্তিদের বেশ উদ্বিগ্ন দেখাল। এতক্ষণ 'কী হয়, কী হয়' এমনি একটি দুশ্চিন্তার দোলায় তারা দুলছিল। কিন্তু দ্বিতীয় গোলটি খাওয়ার পর পরাজয় সম্বন্ধে তারা প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ল। এম. এল. এ. সাহেবকেও বেশ চঞ্চল দেখা গেল। পাহাড়পুরের 'পকেট' ভোটেই তিনি সেবার জিতে গিয়েছিলেন। সেই পাহাড়পুরের পরাজয়ে তিনিও চিন্তিত। তাঁর ডান পাশের চেয়ারটিতে বিমলবাবু বসেছিলেন। তিনি এম. এল. এ. সাহেবের দিকে মাথা হেলিয়ে কানে কানে কী যেন বললেন। হঠাৎ দেখা গেল বিমলবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। সামিয়ানার বাইরে এসে চোখের ইশারায় কমলকে যেন কী নির্দেশ দিলেন। তারপর আবার নিজের চেয়ারটিতে এসে বসলেন।

খেলা তখন পুরোদমে চলছে। পাহাড়পুর দল কিছুতেই উদয়পুরের গোল সীমানার কাছাকাছি পেঁছিতে পারছে না। আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। তারপরই খেলা শেষের বাঁশি বেজে উঠবে। হঠাৎ উদয়পুর দলের গোলপোস্টের কাছে ভীষণ জোরে এক বোমা ফাটার আওয়াজ। গোলপোস্ট ও তার কাছাকাছি বেশ কিছু জায়গা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চারদিকে চিৎকার—চেঁচামেচি। বেশ কিছু দর্শক ঠেলাঠেলি করে দৌড়ে মাঠ ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত। কিছু সাহসী যুবক হৈ-হৈ করে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে গেল। খেলা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।

দেখা গেল উদয়পুর দলের গোলরক্ষক মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। তার ডান পায়ের বেশ খানিকটা অংশ বোমার আগুনে ঝলসে গেছে। কয়েকজন যুবক ধরাধরি করে তাকে ক্লাব ঘরের দিকে নিয়ে গেল।

মাইকে তখন এম.এল.এ. সাহেবের গলা শোনা যাচ্ছে—'আপনারা আতঙ্কিত হবেন না। আপনারা ধৈর্য ধরুন। আমাদের ব্যাপারটা বুঝতে দিন। এমন একটা অভাবনীয় ঘটনার জন্যে আমরা দুঃখিত। উদয়পুরের খেলোয়াড় ও আমাদের সকলের কাছে আমি লজ্জিত। আপনাদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা-ভিক্ষা করছি। খেলার

মাঠে এমন অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি দুষ্কৃতকারীকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। তাকে চরম দণ্ড দিয়ে আমরা এর প্রতিকার করে তবে ছাড়ব।'

ততক্ষণে মাঠ প্রায় ফাঁকা। সব ভিড় ক্লাব ঘরের সামনে উপচে পড়ছে। বিমলবাবু আর এম. এল. এ. সাহেব কী সব বলাবলি করতে করতে ক্লাব ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর একপাশে দাঁড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে তিনি বললেন—'বিমল, আমি তাহলে আসি। আমাকে আবার এখনই একটা মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে হবে। তুমি দেখ, ছেলেটির চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়। আর শোন, আজ রাতের দিকে আমার ওখানে একবার এস। এ ব্যাপারটা নিয়ে একটা চিন্তা-ভাবনার দরকার আছে। এ রকম গুণ্ডামি এ এলাকায় আমরা বরদাস্ত করব না। এদের এমনভাবে শায়েস্তা করতে হবে যাতে এরা বুঝতে পারে এটা কাদের রাজত্ব চলছে।'

ভোলাবাবু চলে গেলেন। বিমলবাবুও সকলকে সেখানে অনর্থক জটলা করতে নিষেধ করে কয়েকজন ছেলে নিয়ে আহতকে দেখার জন্য ডাক্তারখানার দিকে চলে গেলেন। আহত ছেলেটিকে পূর্বেই ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রাত নটা নাগাদ গ্রামপ্রধান বিমলবাবু, স্থানীয় এম. এল. এ. ভোলাবাবুর বাড়ি এলেন। বসার ঘরের ঝকঝকে মোজায়েক করা মেঝেতে দামী সোফাসেট। তার একটিতে ভোলাবাবু বসা। তাঁর মুখোমুখি আর একটিতে অন্য একজন। দুজনে কীসব কথাবার্তা বলছিলেন।

বিমলবাবুকে দেখে হাতের দামী সিগারেটের ছাইটি সোনার জল করা সুন্দর এ্যাশট্রেটায় ঝেড়ে নিয়ে ভোলাবাবু বললেন—'এস বিমল, বস।' তারপর তার সামনে বসা লোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন—'তাহলে আপনি এখন আসুন, সর্দারজী। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে। পারেন তো ঘণ্টা খানেক বাদে একবার আসুন। এখন এর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ দরকার রয়েছে।'

লোকটি উঠে গেলে ভোলাবাবু নিজেই দরজাটি ভেজিয়ে দিতে দিতে বললেন—'কি হে বিমল, আমার কথাগুলোতে কাজ হয়েছে তো? সবাই বুঝতে পেরেছে তো যে এ রকম জিনিস আমরা একদম পছন্দ করি না।'

বিমলবাবু একটু হেসে বললেন—'আপনি দারুণ দিয়েছেন, ভোলাদা। আপনি চলে আসার পর সবাই বলাবলি করছিল—'

বিমলবাবুর কথা শেষ না হতেই ভোলাবাবু ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন—'কী বলছিল সবাই?'

'বলছিল—আমাদের এম. এল. এ. সাহেব এসব ব্যাপারে খুব কড়া। কী রকম কথা দিয়ে গেলেন—'এ ধরনের গুণ্ডাবাজি তিনি বন্ধ করবেন-ই!' নিজের কথা শেষ করে বিমলবাবু ভোলাবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

বিমলবাবুর কথায় এম. এল. এ. সাহেব একটু গর্বের হাসি হাসলেন। তারপর সোফা ছেড়ে একটু পায়চারি করলেন। হঠাৎ থেমে বিমলবাবুর দিকে ঘুরে বললেন—'শোন বিমল, তুমি এক কাজ করবে। ঐ যে ছোঁড়াটা—পচা না কী যেন নাম—ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। কালই যেন আসে। রাত দশটা নাগাদ আমি ফ্রি আছি। ঐ সময় যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। আর শোন, উদয়পুর কিন্তু প্রমাণ করতে চাইবে আজকের এ ঘটনাটা তোমরাই ঘটিয়েছ। কাজেই খুব হুঁশিয়ার—সাবধানে সব ম্যানেজ করবে। তা না হলে কিন্তু আমাদের সকলের মুখোশ খুলে যাবে। ছোঁড়াটাকে কাল আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি ওকে ম্যানেজ করার ব্যবস্থা করব।' তারপর একটু থেমে আবার বললেন—'তোমরা এসব ব্যাপারে আমার সঙ্গে আগে কেন যে পরামর্শ কর না তা বুঝি না।' ভোলাবাবু চোখমুখে কিছু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলেন।

এ রকম একটি কথা যে ভোলাবাবুর দিক থেকে উঠবে সেটি বিমলবাবু ধরেই নিয়েছিলেন। কারণ তাঁর সঙ্গে পূর্বে এ নিয়ে কোন কথা হয় নি। কেবল যখন অ্যাকশান শুরু হতে যাবে, তার

পূর্ব মুহূর্তে খেলার মাঠের প্যাণ্ডেলে বসে কানে কানে জানিয়েছিলেন যে এ রকম একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ভোলাবাবুও তখন সেই অবস্থায় বিকল্প কোন পন্থা বাতলাতে পারেন নি। তবে ঘটনার অব্যবহিত পরেই ভোলাবাবুর সেই জন-দরদী নাতিদীর্ঘ ভাষণ এবং পচাকে মনে ধরার ব্যাপারটি লক্ষ্য করে বিমলবাবু কিছুটা সহজভাবেই ভোলাবাবুর কথার জবাব দিলেন—'ডিশিসনটা খুবই তাড়াহুড়ো করে নিতে হয়েছিল, ভোলাদা। আপনি মিটিং-এ বেরিয়ে গেলেন। আমাদের দলের ছেলেরা এমনভাবে ধরল আমাদের তখন তাদের মতে মত দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না।'

ভোলাবাবু তখন মনে মনে অন্য একটি অধ্যায়ের যোগ-বিয়োগ হিসেব করছিলেন। অন্যমনস্কভাবে শুধু বললেন—'ঠিক আছে, তুমি পচাকে পাঠিয়ে দিও।'

বিমলবাবু বেরিয়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ বাদে পূর্বের সেই সর্দারজী আবার ভোলাবাবুর বসার ঘরে এসে ঢুকল। ভোলাবাবুকে দেখে মনে হচ্ছিল—তিনিও লোকটি আবার আসবে এই জেনেই সেখানে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু লোকটিকে দেখে সোফা ছেড়ে উঠে চলে যাওয়ার ভান করে বললেন—'না সর্দারজী, আপনি আবার কেন এত রাতে এলেন? ওটা আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। এখন সরকারের নীতি অন্য রকম। আমরা এখন দেশের কথা ভাবছি। দেশে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক। এই বেকার ছেলেগুলোর জন্যে আমাদের কিছু করতে হবে। আমাদের এ নিয়ে ভাবতে হবে। তাই সরকারের নীতি হল বর্তমানে মিনিবাসের পারমিটের ব্যাপারে শিক্ষিত বেকার ছেলেদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কাজেই এ অবস্থায় আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।'

সর্দারজী ভোলাবাবুর মুখোমুখি একটি সোফায় বসল। পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে ভোলাবাবুকে একটি সিগারেট অফার করল—নিজেও ধরাল। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল—'সব বাত ঠিক আছে, বাবুজী। হাম ভি বেকার

আছে। মেহেরবানী করকে একঠো পারমিট হামাকে পাইয়ে দিন—আপনার আখেরের কুচ কাম ভি হবে আউর আপনার সরকারের নীতি ভি বাঁচবে। বোলেন তো আউর হাজার দশেক হাম বাড়িয়ে ভি দেবে।'

ভোলাবাবু সম্মতির হাসি হাসলেন। বললেন—'আপনি সত্যিই যেন কী, সর্দারজি! আপনার সঙ্গে কিছুতেই পারা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, ঐ কথাই রইল। তবে বাড়তিটাও আগাম দিতে হবে।'

'জরুর—জরুর! আপনার কুছ ভাবনা নেই। কান্তাপ্রসাদ কভি কথার খেলাপ করে না বাবুজি!' বলেই সর্দারজী আর একবার সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে পচা এল। ভোলাবাবু তার বুদ্ধি ও সাহসের তারিফ করলেন। কাছে বসিয়ে চা-মিষ্টি খাওয়ালেন। বললেন—'বিমলের কাছে তোমার প্রশংসা শুনেছি। তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করি। তুমি আমাদের দলের একজন বড় হিতৈষী।'

পচা হাত কচলে একগাল হেসে বলল—'কী যে বলেন, স্যার! আমাদের কোন রং আছে নাকি! যে পাত্রে রাখবেন সেই পাত্রের রং নেব। এখন আপনাদের দলে আছি। একবার যাচাই করে দেখুন—আপনার জন্যে জান লড়িয়ে দেব।'

ভোলাবাবু একবার ঘরের চারদিক দেখে নিলেন। দরজা জানলাগুলি সব বন্ধ আছে তো? ভেতরের কথাবার্তা বাইরে যাবে না তো? কারণ দেওয়ালেরও কান আছে। তাই তিনি ফিস্‌ফিস্‌ করে পচাকে বললেন—'একজনকে সরিয়ে দিতে হবে। পারবে তো?'

পচা ভোলাবাবুর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলল—'শুধু একবার নামটা বলে দিন না স্যার—দেখবেন দু-দিনের মধ্যে লাশ পড়ে যাবে।'

ভোলাবাবু একটু ভনিতা করে বললেন—'দেখ, এসব জঘন্য ব্যাপারগুলো আমি সব সময় এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু এলাকার

স্বার্থে—আর তোমাদের স্বার্থেও বটে—এটা করা এখন বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। দিন দিন অ্যান্টি পার্টি যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাতে এ এলাকায় শীঘ্রই জঙ্গল-রাজ কায়েম হবে। অঙ্কুরে এর বিনাশ দরকার। তা না হলে তোমার-আমার মতো নিরীহ লোকদের এলাকা ছাড়তে হবে। আর কার মদতে এরা বাড়ছে তাও তুমি জান।' তারপর আরও একটু কাছে এসে চুপি চুপি বললেন—'দিবাকর রায় সেদিনের ছোকরা হে। পূর্ববঙ্গ থেকে এল। অজ্ঞাতকুলশীলই বলতে পার। কোন অভিজ্ঞতা নেই—পরিচিতি নেই—সে কিনা আজ আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে চাইছে! শুনছি, সামনের ইলেকশনে আমার বিরুদ্ধে লড়বে। অবিশ্যি তোমরা থাকতে আমার কোন ভাবনা নেই—সে যেই আসুক। তবে কি জান—মাথাটাকে সরিয়ে দিতে পারলে তোমাদের কাজ-কর্মেরই সুবিধা হবে। তখন তোমাদের কাজে বাধা দেওয়ার মতো হিম্মত কারও থাকবে না।'

ভোলাবাবুর এতসব কথায় পচা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তার টাকা নিয়ে ব্যাপার। এতসব তত্ত্বকথা শোনার ধৈর্য তার নেই। মাল ছাড়—অর্ডার দাও—কাজ হাসিল করে দেব। তার জন্য এত ভনিতা কিসের!

তাই ভোলাবাবুকে আর কিছু বলতে না দিয়ে পচা বলে উঠল—'ঠিক আছে স্যার। আমার কোন্ অ্যাকশনের কী রেট তা বিমলদার জানা আছে। আপনি জেনে নেবেন। তবে হ্যাঁ, আপনার অর্ডার পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে দিবাকর শালার লাশ পড়ে না যায় তো আমার নাম পাল্টে দিয়ে আমার নামে একটা কুত্তা পুষবেন। এ আমি বলে দিচ্ছি।'

ভোলাবাবু পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে পচার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—'কাজ হাসিল কর। বাকি টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু খুব সাবধান। ব্যাপারটা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ টের না পায়।'

পচা টাকাটা প্যান্টের হিপ পকেটে রাখতে রাখতে বলল—

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। পচা কখনও নেমকহারামি করে না।'

ভোলাবাবু পচাকে বাধা দিয়ে বললেন—'আরে না-না। তোমার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। তুমি হলে আমাদের পার্টির একজন বড় মাপের বিশ্বস্ত কর্মী—তোমাকে অবিশ্বাস! কি যে বল! সেসব কিছু নয়। এখন শোন—কখন, কোথায়, কীভাবে কাজটা হাসিল করতে হবে।'

পচা কোমরে হাত দিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়াল। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভোলাবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল।

ভোলাবাবু পচার কানের কাছে এসে আস্তে আস্তে বললেন—'আসছে রবিবার ফকিরা গ্রামে দিবাকরদের পার্টির একটা মিটিং আছে। দিবাকর সেখানে যাবে। আমি খোঁজ নিয়েছি, মিটিং সেরে সে একটা বিশেষ কাজে রাত আটটা থেকে নটার মধ্যে বাড়ি ফিরবে। ওলাইচণ্ডীতলা দিয়ে সে বাড়ি ফিরবে। ওটাই তার বাড়ি ফেরার পথ। ঐ জায়গাটা ভীষণ নির্জন—বড় বড় গাছের ছায়ায় দিনের বেলাও অন্ধকারাচ্ছন্ন। ওর পাশেই একটা পোড়ো মন্দির। সেই মন্দিরের ভেতর তুমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। দিবাকরকে তুমি ভালই চেন। সে ঐ জায়গায় এলেই তোমার কাজ শেষ করে ফেলবে।' তারপর একটু থেমে আবার বললেন—'তা হলে এই কথা রইল। আগামী রবিবার রাত আটটা থেকে নটা।'

ভোলাবাবুর কথা শেষ হলে পচা মিলিটারী কায়দায় তাঁকে একটি স্যালুট দিয়ে বলল—'অল রাইট স্যার। রবিবার ঐ সময়ের মধ্যেই ব্যাটার খেল খতম করে দেব। সোমবার ফের দেখা হবে।' তারপর এক অদ্ভুত শব্দে শিস দিতে দিতে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ভোলাবাবু পাকাপোক্ত লোক। রাজনৈতিক চালে জীবনটাকে তিনি বহুভাবে যাচাই করে দেখেছেন। অনেক অপকর্মের তিনি নায়ক। কিন্তু সব সময়েই তিনি অগ্রপশ্চাৎ সুনিপুণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তবে এগিয়েছেন। এবারও তাই তাঁর পথের কাঁটা দিবাকর রায়ের ওপর খুনের পরোয়ানা জারি করেও তিনি চুপ করে

থাকতে পারলেন না। পচাদের তিনি চেনেন। পচা নিজেই বলেছে তাদের নিজস্ব কোন রং নেই। যে রংয়ের পাত্রে তাদের রাখা হয় তারা সেই পাত্রের রং ধারণ করে। আজ পচা তাঁর হয়ে কাজ করছে। কাল যে সে দিবাকরের দলে ভিড়বে না তার গ্যারাণ্টি কোথায়? যেখানে নজরানা বেশি ওরা সেদিকেই ঝুঁকবে। তাই পচা বাছাধন যাতে চিরদিন তাঁর গোলাম হয়ে থাকে এমন একটি ফাঁদে তাকে জড়িয়ে রাখতে হবে। তিনি ঠিক করলেন তাঁর এক অতি বিশ্বস্ত ফটোগ্রাফার আছে। বয়সে নবীন হলেও তাঁর দলের একজন অন্ধ সমর্থক। তাকে দিয়েও ভোলাবাবু অনেক কুকাজ করিয়েছেন। আজকের এই ফাঁদটিও তিনি তাকে দিয়েই তৈরি করতে চাইলেন।

পরদিন সকালেই তিনি ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। ছেলেটি এলে ভোলাবাবু তাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বললেন—'শোন্ বিশু, আমাদের পার্টির স্বার্থে তোকে একটা কাজ করতে হবে। কাজটা অবশ্যি তেমন কিছু নয়। তবে খুব সাবধানে করতে হবে।'

বিশুকে নিয়ে তিনি দোতলায় একটি নির্জন ঘরে ঢুকলেন। তাকে কাছে বসিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—'আগামী রবিবার রাত আটটা থেকে নটার মধ্যে ওলাইচণ্ডীতলায় একজনের লাশ পড়বে। তোকে খুব সাবধানে আততায়ী সহ তার একটা ফটো তুলে আনতে হবে। ওখানে একটা পোড়ো মন্দির আছে। তার উল্টোদিকে একটা খড়ের গাদা রয়েছে, তা নিশ্চয়ই দেখেছিস। সেই খড়ের গাদার পেছনে লুকিয়ে থাকবি। যখন আততায়ী অ্যাকশনে ব্যস্ত থাকবে ঠিক তখনই চট করে ফটোটা ফ্লাশ ক্যামেরায় তুলে নিবি। কিন্তু খুব সাবধান। পোড়ো মন্দিরের দিকে যাবি না। আর ফ্লাশটাও যেন আততায়ীর চোখে না পড়ে। কাজ সেরেই খড়ের গাদার পেছন দিয়ে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাবি।'

স্থূল মনোধর্মের সাদাসিধে মানুষ বিশু। ভোলাবাবুর

মতো কুটিল ও স্বার্থান্বেষী মানুষ তাকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটা তলিয়ে কখনও দেখেনি। বর্তমান রাজনীতির কঠোর ও কুটিল বাস্তবতার মধ্যে সরল প্রাণ কোন মানুষ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। তাই রাজনীতির খেলায় বিশুর মতো কত সরল প্রাণ যুবক যে রাজনৈতিক নেতাদের দাবার চালের ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছে তার হিসেব কে রাখে! একদিকে জীবন সম্বন্ধে হতাশা আর অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতাদের মিথ্যা প্রলোভন। দুয়ের মাঝে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই তারা আজ প্রলুব্ধ। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে প্রলুব্ধ হয়ে তারা এমন সব কাজ করে বসে তখন মিথ্যা প্রলোভন বুঝেও সে ফাঁদ থেকে তাদের বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। কারণ তারা জানে যে সেখান থেকে পিছু হটা মানেই মৃত্যু। বিশুও আজ ভোলাবাবুর কাছে তেমনি এক খেলার পুতুল।

ভোলাবাবুর কথাগুলি সে তাই চুপচাপ শুনে গেল। কোন প্রতিবাদ বা অনীহা প্রকাশও করতে পারল না, বরং ভোলাবাবুর নির্দেশ মতোই কাজ হবে এমনি স্বীকারোক্তি করে বলল—'আপনি যেমন বলবেন তেমন কাজ হবে। তবে ভোলাদা, আমার কেসটা একটু দেখবেন, আজ প্রায় দু-বছর হতে চলল। কাগজের অফিসের সেই ফটোগ্রাফারের কাজটা আমাকে পাইয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে আসছেন, কিন্তু আজও হল না। একটু দেখবেন।'

ভোলাবাবু বিশুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—'আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমার ঠিক খেয়াল আছে। ওদের চীফ ফটোগ্রাফার বাইরে গেছে—এলেই করে দেব।'

বিশু একবার ভাবল বলে ফেলে—আজ না কাল, কাল না পরশু—এমনি করে করে তো প্রায় দু-বছর পার করে দিলেন। আর কতদিন? কিন্তু না, মুখে সে-কথা সে বলতে পারল না, যেমন অনেক সত্যি কথাই দেশ-কাল-পাত্র বিচার করে অনেক সময়ই বলা যায় না।

বিশুকে নিরুত্তর দেখে ভোলাবাবুই একটু হাসির ভান করে বললেন—'কিরে বিশু! বিশ্বাস হচ্ছে না? আরে বাবা—ভোলা দত্ত যা বলে তার কখনও নড়চড় হয় না রে। এবার ঠিক পাঠিয়ে দেব। যা দেখিনি—রবিবার কাজটা খুব সাবধানে সেরে ফেল্ '

বিশু দেখল, জলে যখন একবার নেমেই পড়েছে তখন কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা সাজে না। তাতে বিপদের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না। তাই সে ভোলাবাবুকে বলল—'ঠিক আছে, ভোলাদা। আপনি অন্য সব ব্যবস্থা পাকা করে রাখবেন। রবিবার রাতে আপনার নির্দেশ মতোই কাজ হবে।' বলেই সে ভোলাবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচে নেমে গেল।

সোমবার কাক-ডাকা ভোরেই গ্রামময় রটে গেল—দিবাকর রায় গতরাতে ওলাইচণ্ডীতলায় নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। কাতারে কাতারে লোক সে দৃশ্য দেখতে গেল। উঠতি নেতা দিবাকর রায়ের প্রাণহীন দেহটি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। স্পন্দনহীন চোখদুটি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। নরম মাংসল তলপেটে ধারাল ছোরার ফলাটি ঢুকিয়ে চিরে প্রায় পুরো ফাঁক করে ফেলেছে। মেটে রংয়ের যকৃত আর নীল রংয়ের পাকানো-প্যাঁচানো একদলা নাড়িভুঁড়ি একপাশে জমাট বাঁধা রক্তের ওপর ঝুলে পড়ে আছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। কিছুক্ষণ বাদে ভোলাবাবুও এলেন। গ্রামপ্রধান বিমল বোস এলে ভোলাবাবুই তাঁকে থানায় খবর পাঠাতে বললেন।

পুলিস এল। পুলিসের কাছে ভোলাবাবু তীব্র ভাষায় খুনের নিন্দা করলেন। আততায়ীকে অবিলম্বে খুঁজে বের করার জন্য পুলিসের কাছে জোরালো দাবি রাখলেন।

পুলিস যথারীতি কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারপর লাশ পোস্টমর্টেম করার ব্যবস্থা করে চলে গেল।

দিন কয়েক বাদে হঠাৎ পুলিস খুব সক্রিয় হয়ে উঠল। নিরীহ নিরপরাধ বেশ কিছু লোককে থানায় ধরে নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসাবাদ করল। কয়েকজনকে ছেড়ে দিল। আর কিছু লকআপে রেখে

দিল। অত্যাচার নিপীড়নও চলল। কিন্তু সঠিক প্রমাণাভাবে একে একে আবার সকলকে ছেড়ে দিল। দিবাকর রায়ের খুনের রহস্য সেখানেই চাপা পড়ে গেল।

এদিকে দিবাকর রায়ের নৃশংস খুনের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী হয়ে ভোলাবাবুর হাতে এসে গেছে। কে কীভাবে তাকে হত্যা করেছে তা পরিষ্কার ছবিতে ফুটে উঠেছে। খুনী পচাকে তার জীবনমঞ্চে নাচাবার সূক্ষ্ম তারটি এখন দক্ষ বাজিকর ভোলাবাবুর হাতের আঙুলে বাঁধা। 'নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে' তেমনি তিনি এখন যেমন নাচাবেন পচা তেমনি নাচবে। প্রকারান্তরে তিনি পচাকে সেটি জানিয়েও দিয়েছেন। পচা এখন তাঁর সবরকম অপকর্মের প্রধান হাতিয়ার। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখনই কোন দাঙ্গা, বোমাবাজি বা বদলি নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখনই পচার ডাক আসে আর সে-ও আলাদীনের প্রদীপ-জাত দৈত্যের ন্যায় মুখ বুজে ভোলা-বাবুর সব আদেশ তামিল করে যায়। অবশ্য এসব কাজের জন্য পচাকে তিনি তার পাওনা দিতে কসুর করেন না। কারণ তিনি জানেন এটা তাঁর ইনভেস্টমেণ্ট। পচাকে দিয়ে তাঁর পথের সব কাঁটা দূর করে তিনি যদি আর একটি টার্ম এম.এল.এ হতে পারেন তাহলে এ রকম জন কয়েক পচাকে পুষেও তাঁর পরের দু-তিন জেনারেশন ফুল-বাবুটি সেজে দিব্যি পায়ের ওপর পা ফেলে চালিয়ে যেতে পারবে।

পঞ্চায়েত ইলেকশন এসে গেছে। তাই রাজনৈতিক কর্তাদের এতদিনের সুপ্ত দেশপ্রেম হঠাৎ জেগে উঠেছে। যিনি এতদিন জন-প্রতিনিধি হয়ে নিজের ধান্দায় থেকে শুধু গাল-ভরা বুলি আর মাতব্বরি চাল চেলে কাটিয়েছেন তিনি আজ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের দলের ছেলেদের রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার আর নর্দমা সাফাই করাতে ব্যস্ত। বোকা জনগণকে আরও বোকা বানিয়ে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার এ-এক বিচিত্র প্রতিযোগিতা। সব নেতাই এখন ব্যস্ত। জনসেবাই এখন তাঁদের ব্রত। সভা-সমিতি আর মিছিলের মাধ্যমে নিজেদের জনদরদী আর সবচেয়ে সাচ্চা পার্টি বলে

প্রচার করে সব দলই ভোট কেড়ে নেবার জন্য আদা-জল খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। ভোলাবাবুও বিশেষভাবে চিন্তিত, পঞ্চায়েত ইলেকশনে তাঁর দল যদি শক্ত ভিত তৈরি করতে না পারে তাহলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর আসনটিও তিনি পাকাপোক্ত করে রাখতে পারবেন না।

রাস্তার পাশের প্রতিটি দেওয়াল কোন না কোন পার্টি নিজেদের দখলে রেখেছিল। এখন প্রতিটি দল দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত। কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। তবে পাহাড়পুরে দুটি দলের প্রাধান্যই বেশি। একটি ভোলাবাবুর দল—অন্যটি মৃত দিবাকর রায়ের। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তার দলের ছেলেরা যেন ভীষণ মরিয়া হয়ে উঠেছে। তুষের আগুনের মতো তাদের ভিতরে ভিতরে যেন একটি চাপা আগুন—একটি চাপা আক্রোশ—যার বহিঃপ্রকাশ নেই অথচ তীব্রতা আছে। দেওয়াল-লিখন, পোস্টারিং, পথসভা প্রভৃতির মাধ্যমে তারা তাদের দলের ভাবমূর্তিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। পাহাড়পুরের চৌরাস্তার মোড়টিকে তারা পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ করে দিয়েছে।

ভোলাবাবু দুদিন পাহাড়পুরে ছিলেন না। পাশের এক কনস্টিটিউয়েন্সিতে গিয়েছিলেন ভোটের তদারক করতে। ফিরে এসে তাঁর তো চক্ষুস্থির। পাহাড়পুর নিয়ে তাঁর একটি বিরাট আশা। তাঁর দল বরাবরই এখানে ভাল ভোট টানে। কিন্তু এবার কী করছে তাঁর দলের ছেলেরা? পুরো চৌরাস্তার মোড়টি তাঁর অপোনেণ্ট পার্টির দখলে।

গ্রামপ্রধান বিমল বোসকে ডাকলেন। পচাকেও ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে।

বিমলবাবু এলে ভোলাবাবু একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেই বললেন—'কি গো বিমল, চৌরাস্তার মতো অমন একটা ইমপরটাণ্ট জায়গা ওরা যে প্রায় কব্জা করে ফেলেছে। তোমার ছেলেরা সব ঘুমিয়ে আছে নাকি?'

বিমলবাবু একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন—'জানেন ভোলাদা, ছেলেগুলো এবার যেন কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে। বহু চেষ্টা করছি—টাকাও ঢেলে যাচ্ছি, তবু কেমন যেন একটা ঢিলে-ঢালা ভাব।'

ভোলাবাবু কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কী যেন ভাবলেন। তারপর বিমলবাবুর কাছে এসে বললেন—'তাহলে চলবে না। ওদের চাঙ্গা কর। আরও প্রলোভন দেখাও।'

ঠিক সেই সময় পচা এসে হাজির। তাকে দেখে ভোলাবাবু আরও চটে গেলেন। গলার স্বরটা বেশ একটু উঁচু করেই রাগত স্বরে বললেন—'তোমাকে পোষা হচ্ছে কিসের জন্যে? অন্য দলের ছেলেরা চৌরাস্তার মোড়টা পুরোপুরি দখল করে নিল, আর তুমি আমাদের ছেলেদের নিয়ে কিছুই করতে পারলে না? অপদার্থ!' রাগে তিনি ফুসতে লাগলেন।

'তোমাকে পোষা হচ্ছে কিসের জন্যে?'—ভোলাবাবুর এ কথাটা পচার ভাল লাগল না। সে একবার ভাবল প্রতিবাদ করে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভোলাবাবুর দেখানো সেই দিবাকার রায়ের খুনের ছবিটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভোলাবাবু তাকে 'ব্ল্যাক-মেইল' করছেন। ঐ ছবি পুলিসকে দিলে তার ফাঁসি অবধারিত। সে আর প্রতিবাদ করতে পারল না। কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অপরাধীর ন্যায় বলল—'আমাকে শুধু শুধু বকছেন, স্যার! ছেলেরা এবার—'

পচার কথা শেষ করতে না দিয়েই ভোলাবাবু ধমকে উঠলেন—'আমি কোন অজুহাত শুনতে চাই না! ছেলেদের নিয়ে আজ রাতের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করবে যাতে ঐ চৌরাস্তায় আমাদের প্রাধান্য চোখে পড়ে। প্রয়োজন হলে জোর করে ওদের পোস্টার সরিয়ে ফেলতে হবে। যাও, এখনই ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ কর।'

শরতের সন্ধ্যা গড়িয়ে গড়িয়ে রাতের গহ্বরে প্রবেশ করল। পাহাড়পুরের আকাশে-বাতাসে একটি মিষ্টি হিমের পরশ। তারা

ঝলমলে আকাশ। নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা নেমে না এলেও পাহাড়-পুরের অনেক রাস্তাই তখন জনবিরল। কিন্তু চৌরাস্তার মোড়টি তখনও সরগরম। দোকানে দোকানে তখনও আলো জ্বলছে। কোণের দিকে হারু ঘোষের দেশী মদের দোকানটি তখনও খোলা। তার সামনে পাতা বেঞ্চিগুলি দখল করে কয়েকটি বকাটে ছেলে গুলতানি মারছে। ইলেকশনের দৌলতে বেশ কিছু তাদের পকেটে এসেছে। প্রত্যেকের পাশে বেঞ্চির উপর একটি করে মাটির খোরাই। মনে হয় 'মা কালি' মার্কা কিছুটা দেশী মাল পেটে পড়েছে—নয়ত পড়বে—তারই প্রস্তুতি।

সেই সময় পচা আর ভোলাবাবুর দলের কিছু ছেলে এসে চৌরাস্তায় হাজির। কারও হাতে পোস্টার, কারও কাছে মই, কেউ বা বয়ে এনেছে কাতা খানেক দড়ি। একবার তারা চারদিকে তাকাল। যারা মদের আসর সাজিয়ে বসেছে তাদের প্রায় সকলকেই পচা চেনে। দু-একজন তাদের দলের ছেলেও আছে। মদের আসরে দলাদলি নেই। সেখানে সবাই এক—ভাই-ভাই।

চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দুপাশের দুই দোকান ঘরের চালের সঙ্গে বেশ উঁচু করে দড়ি টাঙানো। তার সঙ্গে দিবাকর রায়ের দলের পোস্টারগুলি সুন্দরভাবে ঝোলানো। এরকম তিন-চার সারি। পচা ঠিক করল তাদের আনা পোস্টারগুলি এমন ভাবে ঝোলাতে হবে যাতে যেদিক দিয়েই দেখা যাক না কেন, দিবাকর রায়ের দলের পোস্টারগুলি সহজে কারও নজরে না আসে।

বিপক্ষদল ইতিমধ্যে টের পেয়ে গেছে। পচারা সবে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে সেই মুহূর্তেই পনের-বিশ জন ছেলে হৈ-হৈ করে ছুটে এল—'কই দেখি, কোন্ শালা আমাদের পোস্টার সরাচ্ছে?'

পচার দলের এবং এরা সকলেই পাড়ার বকাটে ছেলে। কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেই এর মধ্যে নেই। কারণ তারা জানে বর্তমান রাজনীতিতে ভোট একটি প্রহসন। প্রার্থী সেখানে গৌণ,—তার দলই মুখ্য। জোর যার ভোট তার। তাই সাধারণ মানুষ কখনই এ

ভোট যুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চায় না।

এখানে কোন দলই কম যায় না। কাজেই দুদলে বচসা। বচসার পরিণতি ধাক্কাধাক্কি—পরে মারামারি এবং তারপরে খুন-খারাপি।

দোকানের আলোগুলি পটাপট্ নিভে গেল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে যে যার দোকানে আশ্রয় নিল। হঠাৎ একটি ভীষণ পাওয়ার-ফুল বোমা এসে পচার পায়ের কাছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটালো। ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। পচা পারল না। তার একটি পা বোমার প্রচণ্ড আঘাতে সম্পূর্ণ থেঁতলে গেছে। সে সেখানে পড়ে কাতরাতে লাগল।

সংবাদটি পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। পচার দলের আরো সব ছেলেরা ছুটে এল। ধরাধরি করে রিকশায় বসিয়ে পচাকে কাছাকাছি একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হল।

প্রাথমিক পরীক্ষার পর ডাক্তার বললেন—'এখনই একে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমি অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে দিচ্ছি। এখানে এর চিকিৎসা সম্ভব নয়।' পচাকে নিয়ে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের অ্যাম্বুলেন্স ছুটল সদর হাসপাতালের দিকে।

পরদিন সকালে ভোলাবাবু আর গ্রাম প্রধান বিমলবাবু সদর হাসপাতালে গেলেন পচাকে দেখতে। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বললেন—'পায়ের কণ্ডিশন খুব সিরিয়াস। হাঁটুর নিচ থেকে পুরো অংশটা কেটে বাদ দিতে হবে।'

মাস দেড়েক বাদে ক্রাচে ভর দিয়ে পচা যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল তখন পঞ্চায়েত ইলেকশন শেষ। পাহাড়পুরে ভোলা-বাবুর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বেশ কয়েকটি আসন তাদের হারাতে হয়েছে।

সামনে জেনারেল ইলেকশন। ভোলাবাবু এবারও নমিনেশন পেয়েছেন। তাঁর এখন অনেক কাজ। তাঁর অপোনেণ্ট পার্টি—দিবাকরের দল—এবার জোর কদমে প্রচার অভিযানে নেমে পড়েছে। ভোলাবাবু এবার বেশ একটু চিন্তিত। দিবাকরকে খতম করেও তিনি

নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। বরং দিবাকরের খুনটি তাঁর দলের কাছে যেন একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর মোকাবিলা সহজ-পথে সম্ভব নয়, একটু বাঁকা পথ নিতে হবে।

"সায়েন্টিফিক রিগিং" কথাটি শুনতে বেশ ভাল লাগে ভোলা-বাবুর। কিন্তু তাতে যদি কাজ না হয়। তাই জাল ভোট ছাড়াও ভয় দেখিয়ে ভোট ভাঙানো, জোর করে বুথ দখল—এসবের জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভাল।

ভোলাবাবু যখন এ সব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় পচা একদিন এল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। একটি পা হারাবার পর থেকে ভোলা-বাবুর দেওয়া মাসোহারা তার বন্ধ। অনেকদিন থেকেই পচা বাড়ি থেকে বিতাড়িত। আর বাড়িতে তার কে-ই বা আছে! বাবা-মা কবে মারা গেছেন তা তার মনেও পড়ে না। দাদার কাছে মানুষ। কিন্তু বৌদি ঠাকরুণ ঘরে আসার পর থেকে দাদার কাছে সে পর। তারপর থেকেই আস্তে আস্তে তার এই অন্ধকার জগতে নেমে আসা। এখন সে সম্পূর্ণ পঙ্গু। নিজের পেট চালানো দায়। হাতে যা কিছু ছিল তা-ও একমাসে শেষ। তাই একান্ত নিরুপায় হয়েই সে ভোলা-বাবুর কাছে এল। কিছু সাহায্য তার নিতান্ত প্রয়োজন।

কলিংবেল টিপতেই ভোলাবাবু বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। পচাকে দেখে তিনি বিরক্ত হলেন। অবাঞ্ছিত মানুষকে দেখলে মানুষ যেমন তার দিকে তাকায় তিনিও সেইভাবে পচার দিকে তাচ্ছিল্যভাবে তাকিয়ে রইলেন।

পচা কাকুতি-মিনতি করে বলল—'স্যার, আমাকে বাঁচান। তা না হলে না খেয়ে মরে যাব।'

ভোলাবাবু কোন জবাব দিলেন না। পকেট থেকে একটি দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটি ধরালেন।

ভোলাবাবুকে নিরুত্তর দেখে পচা তার পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর পা দুটি জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ভোলাবাবু তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে বললেন—'এখান থেকে দূর হও। তোমার মতো একটা পঙ্গু অকর্মাকে পোষার আমার কোনই দরকার নেই। জেনে রাখ গরু যদ্দিন দুধ দেয় তদ্দিনই তাকে খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। দুধ না দিলে তার স্থান হয় কসাইখানায়। তোমাকে কসাইখানায় পাঠাতে পারতাম। কিন্তু পাঠাব না। তোমাকে ছেড়ে দিলাম। এবার নিজে চরে খাও। আর তা যদি না পার তো মর। কিন্তু খবরদার, আমার কাছে আর এস না।' এই বলে পকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বের করে পচার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন।

মান-অপমান বোধটি পচা বহুদিন থেকেই ভুলে গিয়েছিল। নিজের ফেলে আসা দিনগুলিতে এসব বিচার-বিশ্লেষণ করার মানসিকতা তার ছিল না। কিন্তু ভোলাবাবুর আজকের এই নির্মম ব্যবহারে সে নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ করল। সে কোনদিনই ধোয়া তুলসী পাতাটি ছিল না। কিন্তু এই ভোলাবাবুই তাকে এনে এই নিকৃষ্টতম স্থানে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর জন্যেই সে আজ তিন-তিনটি খুনের অপরাধে অপরাধী। তার এই অন্ধকারময় জীবনের জন্যে ভোলাবাবুই দায়ী। তাঁর হয়ে কাজ করতে গিয়েই সে আজ চিরদিনের মতো পঙ্গু। কাজেই এ অপমান তার কাছে অসহ্য।

পচা দশ টাকার নোটটি স্পর্শও করল না। অপমানের জ্বালা নিঃশব্দে হজম করে সোজা সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

পাহাড়পুরের হাটতলায় আজ ভোলাবাবুর ইলেকশন মিটিং। ভাদুই সংবাদটি পচাকে দিয়েছিল। ভাদু এখন ভোলাবাবুর দলের প্রধান মস্তান। পচার অ্যাকসিডেন্টের পর ভোলাবাবুই তাকে পচার জায়গায় বসিয়েছেন। তার আগে পর্যন্ত সে ছিল পচার জুনিয়র।

ভোলাবাবুর বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে আসার পর দুপুরের দিকে একবার দেখা হয়েছিল ভাদুর সঙ্গে। কিন্তু সে তার অপমানের কথা ঘুণাক্ষরেও ভাদুর কাছে প্রকাশ করেনি।

কথায় কথায় ভাদুই বলেছিল—'আজ আর ভোলাদার মিটিংএ থাকতে পারছি না। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। কেমন যেন জ্বর-জ্বর লাগছে।'

তাই সন্ধ্যার দিকে পচা ঘুরতে ঘুরতে ভাদুর বাড়ির দিকে গেল। সকালের ঘটনার পর থেকে তার মনটি যেন কেমন বিগড়ে আছে।

ভাদুর বাড়ি এসে তাকে ডাকতেই ভাদুর ছোট বোন সতী বেরিয়ে এসে বলল—'দাদা তো বাড়ি নেই, পচাদা। ডাক্তারের কাছে গেছে। দাদার শরীরটা ভাল নেই। জ্বর হয়েছে, তুমি দাদার ঘরে বস। এখনই এসে যাবে।'

পচা একবার ভাবল চলে যাবে। তারপর আবার কী ভেবে এসে ভাদুর ঘরে ঢুকল।

ঘরের একপাশে পুরানো রংচটা তক্তাপোশের উপর আধ-ময়লা বিছানা। বিছানার পাশে তেলচিটে হাতলবিহীন একটি চেয়ার। তার সামনে একটি সাধারণ টেবিল। পচা চেয়ারটি টেনে বসে পড়ল। ভাদুর বোন সতী নিজের কাজে অন্য ঘরে চলে গেছে। দূর থেকে মাইকে এম. এল. এ. ভোলা দত্তের নির্বাচনী বক্তৃতার রেশ ভেসে আসছে পচার মনটি কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সামনে টেবিলের ড্রয়ারটি নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই সে টেনে খুলে ফেলল। হঠাৎ যেন তার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভেতরে ওটা কী? সে যেন নিশ্চল হয়ে যায়। খোলা ড্রয়ারটি খোলাই পড়ে রইল। সেটি বন্ধ করতেও সে যেন ভুলে যায়।

ঐ তো সেই রিভলবারটি যেটি বহুদিন তার হেপাজতে ছিল। ভোলাবাবুই দিয়েছিলেন তাকে। তার গোটা কয়েক খুনের সাক্ষী এই রিভলবারটি। সে পঙ্গু হয়ে পড়লে ভোলাবাবু তার কাছ থেকে ওটি নিয়ে নেন।

রিভলবার এমনই জিনিস—ও যার কাছে থাকবে তার কথা বলবে। হঠাৎ পচার মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে রিভলবারটির

দিকে একবার তাকাল। তারপর সেটি আস্তে আস্তে হাতে তুলে নিল। সে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেউ কোথাও আছে কিনা দেখে নিল। তারপর ফুল লোডেড রিভলবারটিকে পকেটে পুরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

দরজার কাছে এসে ভাদুর বোনকে ডেকে সে বলল—'আমি যাচ্ছি রে সতী। ভাদু কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। আমার একটা জরুরী কাজ রয়েছে। পরে আবার আসব। তুই ভাদুকে বলে দিস।' বলেই সে উঠোনে নেমে পড়ল। সতী রান্নাঘরে কী করছিল। সেখান থেকেই জবাব দিল—'তুমি আর একটু বসলে পারতে, পচাদা। দাদা হয়তো এখনই এসে যাবে।'

সতীর কথা শেষ হওয়ার আগেই পচা উঠোনের মাঝ বরাবর এসে গেছে। সেখান থেকেই বলল—'না রে, আমি যাচ্ছি।' বলেই সে ক্রাচে ভর দিয়ে উঠোন পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভোলাবাবুর হয়ে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন ঐ এলাকার এম. পি.। মিটিং-এর শেষে ভোলাবাবু তাঁকে নিয়ে লোকাল পার্টি অফিসে গেলেন। সেখানে কাজ সেরে এম. পি-কে বিদায় দিয়ে তিনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন রাত তখন প্রায় দশটা। নির্জন গ্রাম্য পথ। বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আমবাগানের পাশ দিয়ে রাস্তা। রাতের অন্ধকারটি তাই একটু বেশি গাঢ়।

ভোলাবাবু পা চালিয়ে জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছেন। বাড়ি ফিরে ইলেকশনের কিছু কাজকর্ম সারতে হবে। তারপর খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া দরকার। সকালে উঠেই আবার সদর পার্টি অফিসে ছুটতে হবে। একটু এগিয়ে তিনি বাঁ দিকে টার্ন নিলেন। হঠাৎ দুড়ুম-দুড়ুম আওয়াজে আম-কাঁঠালের বাগানটি কেঁপে উঠল। গাছের ডালে ঘুমন্ত পাখিগুলি ভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। জাঁদরেল এম. এল. এ. ভোলা দত্ত তখন মাটিত পড়ে কাতরাচ্ছেন। আবার রিভলবারের গুলির আওয়াজ। এবার গুলিটি তাঁর কণ্ঠনালী ভেদ করে বেরিয়ে গেল। ভোলাবাবুর ভূলুণ্ঠিত

দেহটি দু-একবার দাপাদাপি করে চিরদিনের মতো নিশ্চল হয়ে গেল। পথের কাঁটা দিবাকর রায়ের প্রাণহীন দেহটি সেদিন যেভাবে ওলাইচণ্ডীতলায় পড়েছিল, ভোলা দত্তর অসাড় প্রাণহীন দেহটিও আজ আম-কাঁঠালের বাগানের পাশে তেমনি পড়ে রইল।

সেদিনের সেই নিশুতি রাতের অন্ধকারে পাহাড়পুরের ভোটের তালিকা থেকে দুটি নাম চিরতরে মুছে গেল—একটি ভোলা দত্তের নিজের—আর একটি পচার। কারণ সেই রাত থেকে পচার খোঁজ আর কোনদিন পাওয়া যায়নি।

* * *

ভোলা কয়ালের হাট

সোনারপুর গ্রাম। নাম সোনারপুর হলেও তার দেহের কোথাও সোনা তো দূরের কথা, সামান্য সোনার জলের চিহ্নও কোনদিন দেখা যায়নি। অতি সাধারণ এক অখ্যাত গ্রাম। পূর্ব বাংলার চোখ জুড়ানো আর মন-মাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া সোনারপুরের আর কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। ছায়া-ঢাকা গ্রাম্য মেঠো পথ, আম-কাঁঠালের বাগান, নারকেল আর সুপারি গাছের দীর্ঘ সারি—এই নিয়েই সমগ্র গ্রামটি পরিব্যাপ্ত, মাঝে মাঝে ছায়া-ঘেরা দশ-পনেরটি বাড়ি নিয়ে এক একটি পাড়া। কোথাও দুই পাড়ার মাঝে বিস্তারিত শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে দু-একটা জীর্ণ মন্দির। সংস্কারের অভাবে সবগুলোরই ভগ্নদশা। পলেস্তারা খসানো নোনা ধরা ইঁট। কোন কোনটির গায়ে বট-অশ্বত্থ বেড়ে উঠেছে। তাদের মূল শিকড়গুলো মন্দিরের গা বেয়ে মাটি পর্যন্ত প্রসারিত। স্নেহশীলা জননী যেমন তার সন্তানকে বুকে আঁকড়ে রেখে পতনের হাত থেকে রক্ষা করে, এই বট-অশ্বত্থের শাখা-শিকড়গুলোও তেমনি জালের ন্যায় মন্দিরগুলোকে বেষ্টন করে তাদের অনিবার্য পতনের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে।

কোন এক সময় এই মন্দিরগুলোতে বিভিন্ন দেব-দেবীর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এখন দেখে তার কিছুই বোঝা যায় না। এখন শুধু শিবতলা, কালীতলা বা শীতলাতলা এই নামকরণের মাধ্যমেই তাদের অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এমনিই তিন-চারটে পাড়া নিয়ে সোনারপুর গ্রাম। পাশ দিয়ে বেগবতী রূপসী মেঘনা প্রবাহিত। তার টলটলে তুঁতে নীল জলধারায় দীর্ঘ বনবীথির প্রতিচ্ছবি। মেঘনার পাড় ঘেঁষে পায়ে-হাঁটা মেঠো পথ। কিন্তু সে পথের স্থায়িত্ব বড়ই কম। মেঘনার

করাল গ্রাসে তা পরিবর্তনশীল। আজ যেটা পথ, কাল সেটা যে মেঘনার জলে বিলীন হয়ে যাবে না, তা কেউ-ই বলতে পারে না।

সেই সোনারপুর গ্রামের ছোটখাট জমিদার হরিহর মুখুজ্জে। মুখুজ্জে পাড়ায় প্রায় বিঘা তিনেক জমি নিয়ে তার দ্বিমহলা দ্বিতল পাকা বাড়ি। এ পাড়ায় একমাত্র হরিহর মুখুজ্জের বাড়িটিই পাকা। উঠোনটি বিস্তৃত এবং বাড়ির সামনে শান্ বাঁধানো পুকুর। উঠোনের একপাশে নাটমন্দির—সামনে দক্ষিণমুখী গৃহদেবতার মন্দির।

হরিহর মুখুজ্জে বয়সে প্রাচীন না হলেও বৈষয়িক দুষ্টবুদ্ধিতে তার সমকক্ষ লোক সমগ্র সোনারপুরে আর একজনও ছিল না। জাল-জোচ্চুরি করে সে লোককে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিত। তারপর সেই অসহায় দরিদ্র লোকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ছোটখাট সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিত। এভাবে পৈত্রিক সম্পত্তির পরিধি সে অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছিল, মুখুজ্জের শ্যেন দৃষ্টি কখন কীভাবে কার ওপর পড়বে এটা কারুরই জানা ছিল না। 'দুষ্টকে বড় পিড়ি' এই মানসিকতা নিয়ে অনেকেই তার সঙ্গে ওঠা-বসা করত। আবার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মোসাহেবের দলও তার চারপাশে ঘুর-ঘুর করত।

প্রতিবছর গৃহদেবতার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষ্যে জেলা শহর থেকে নামকরা যাত্রার দল এনে হরিহর মুখুজ্জে যাত্রার আসর বসাত। পর পর তিনরাত যাত্রা চলত। বাজি পুড়ত। হৈ-হুল্লোর আর যত রকম বদ নেশা আছে তার কোনটাই এই তিন দিনে হরিহর মুখুজ্জে বাদ দিত না। বহিরাগত লোক যাত্রা দেখত। অন্দর-মহলের খবর তাদের কাছে পেঁছিত না। ফলে পাশাপাশি দু-চারখানা গাঁয়ের লোক ধন্য ধন্য করত। মোসাহেবের দল মুখুজ্জের প্রাপ্য সেই প্রশংসার তিলকে তাল করে এনে তার কানে পেঁছে দিত। মুখুজ্জের ছত্রিশ ইঞ্চি বুকখানা তাতে চল্লিশ ইঞ্চিতে যেয়ে দাঁড়াত। মুখে গর্বের হাসি ফুটিয়ে বলত—'বুঝেছো হে, শুধু

টাকা থাকলেই হয় না। দিল থাকা চাই। 'কালচার' বলে একটা কথা আছে। সেটা শিখতে হয়, টাকা দিয়ে কেনা যায় না। পাশের গাঁয়ের অবিনাশ রায়ের টাকা কি আমার চেয়ে কম? যাওনা সেখানে—দেখবে পুজোর সময় যত সব হাভাতের দল এসে তার বাড়িতে জড় হবে। এসব হল সস্তায় নাম কেনা। গরিবদের দু-পাঁচখানা কম্বল দান করলাম আর একবেলা পেটপুরে খেতে দিলাম—তাতেই যেন বিরাট একটা কিছু হয়ে গেল। এসব হল বুজরুকি, সস্তায় বাজিমাৎ করার ফন্দি। আনুক না দেখি শহর থেকে একটা নামকরা যাত্রার দল। তাহলে টের পাবে কত ধানে কত চাল।' শ্রোতাদের সকলে অনুমোদনের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে তাকে উৎসাহিত করে।

হরিহর মুখুজ্জে আর যেন কী বলতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় এক শীর্ণকায় দরিদ্র লোক বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়াল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। লোকটির মুখে দশ-পনের দিনের না কামানো কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সপ্রতিভ চোখ। চোখের তলায় অপুষ্টিজনিত কালচে দাগ। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে গভীর আত্মপ্রত্যয় এবং দৃঢ়তার ছাপ। গায়ে একটা অতি সাধারণ ময়লা হাফ শার্ট। হাঁটুর ওপর মালকোঁচা দিয়ে পরা ময়লা ধুতি।

হরিহর মুখুজ্জে ওর দিকে তাকাতেই অতি বিনীতভাবে সে বলল—'আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন মুখুজ্জে মশাই? আপনার চাকর গোবিন্দ আমায় তাই বলে এল।'

লোকটিকে দেখে হরিহর মুখুজ্জের আত্মপ্রশান্তির জোয়ারে যেন হঠাৎ ভাটার টান এসে গেল। একটা ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত এবং অসন্তুষ্টির ভাব তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে দমন করে মুখে হাসির রেখা টেনে বলল—'এস ভোলা, তোমার কথাই হচ্ছিল। অনেক ভেবে দেখলাম। তোমার সাতপুরুষের ভিটে। চট করে সেটাকে আমার হাতে তুলে দিতে তোমার মন চাইছে না। বেশ ভাল কথা। তোমাকে আমি আরও সাতদিন সময় দিলাম। এর

মধ্যে মনস্থির করে ফেলো, আর অন্য কোথাও নিজের থাকার একটা ব্যবস্থা করে নাও। তোমাকে তো আমি বলেছি—ও জমিটা আমার চাই।'

রাক্ষসী মেঘনা যেমন কত পথ, কত জনপদ নিজের উদরে পুরে দিনের পর দিন নিজের পরিসর বৃদ্ধি করে চলেছে—হরিহর মুখুজ্জেও তেমনি অসহায় গরিব লোককে প্রলোভন দেখিয়ে মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে দিয়ে তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিজের সম্পত্তির পরিধি দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু একটা জায়গায় এসে তার সেই সম্পত্তি আত্মসাতের বিজয় রথটি বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই বিজয় রথের গতিরোধের কারণ এই ভোলা কয়াল। জীবন সম্বন্ধে যারা আত্মভোলা—প্রলোভনের টোপ তাদের গেলানো কঠিন। তাছাড়া ভোলা কয়াল লোকটা নিজের ব্যাপারে উদাসীন হলেও অন্য ব্যাপারে এত হুঁশিয়ার এবং ন্যায়নিষ্ঠ যে, কোন মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে তার সম্পত্তিটা কিছুতেই বাগানোও যাচ্ছে না। অথচ ঐ সম্পত্তিটা হরিহর মুখুজ্জের চাই-ই চাই।

তার বাড়ির সামনের ভোলা কয়ালের বাড়ি সমেত জমিটা নিজের কব্জায় আনতে পারলেই তার বাড়ির দরজায় একটা হাট বসতে পারে। এটা তার বহু দিনের শখ। কিন্তু ঐ জমিটা না পেলে বাড়ির দরজায় হাট বসানোর মতো জায়গা তার নেই। ভোলা কয়ালকে সে বহু প্রলোভন দেখিয়েছে—ভয় দেখিয়েছে—কিন্তু কিছুতেই লোকটাকে বাগে আনতে পারছে না। তাই গোবিন্দকে দিয়ে ভোলাকে ডাকিয়ে এনে তাকে আরও সাত দিন সময় দিয়ে আপসে কিছু করা যায় কিনা ভেবে দেখার জন্য একটা শেষ সুযোগ দিল।

যৌবনের প্রারম্ভে ভোলা তার বাবা-মাকে হারিয়েছে। অর্থাভাবে শুধু বেঁচে থাকার জন্য তার বাবা-মা যে-সংগ্রাম চালিয়ে গেছে, সেটা তাদের মৃত্যুর পর ভোলার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনে

দেয়। সেই কারণে সে বিয়ে-শাদি করে সংসার পাতবার কথা চিন্তাও করেনি। সামান্য কুঁড়েঘর সহ একটা বসতবাড়ি। এর বাইরে নিজের বলতে ভোলার আর কিছু নেই। অন্যের বাড়িতে দিনমজুরি খেটে যা পায় তাতেই তার একটা পেট কোন রকমে চলে যায়। সকালে পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে কাজে বেরিয়ে যায়। দুপুরে যেখানে কাজ করে সেখানে সামান্য জলখাবার দেয়। তারপর দুটো-আড়াইটে নাগাদ বাড়ি ফিরে আসে। স্নান করে। তারপর যা হোক কিছু রান্না করে খেয়ে নেয়। বাকিটা রাতের খাবার হিসাবে তুলে রাখে। রাতে খেয়ে-দেয়ে অবশিষ্ট ভাতে জল ঢেলে রাখে। পরের দিন সকালে তাই খেয়ে সে আবার কাজে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই ঘোষালদের হরিসভায় এসে বসে। আপনমনে হরিনাম কীর্তন করে, ভাবে আত্মহারা হয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি যায়। ভক্তেরা বলে ভাবের পাগল। কেউ কেউ বলে পাগলা ভোলা। কিন্তু হরিহর মুখুজ্জের দলের লোক বলে—বেটা একটা আস্ত শয়তান। লোকের মন পাবার জন্যে এসব স্রেফ ভণ্ডামি।

যে যাই বলুক ভোলার তাতে কিছুই যায় আসে না। সে কারও কাছ থেকে যেমন কোন অনুগ্রহ চায় না তেমনি কেউ তাকে অকারণ নিগ্রহ করে সেটাও সে বরদাস্ত করতে পারে না। দিন মজুরি খেটে সামান্য যা পায় তা থেকে অন্ধ-আতুড়কে সে প্রায় রোজই কিছু না কিছু দান-খয়রাতি করে। বাবা-মার কাছ থেকে পাওয়া কুঁড়েঘরটি তার কাছে স্বর্গের চেয়েও বড়। সারা দিনের পরিশ্রমের পর রাতে সে যখন খেয়ে-দেয়ে তার শতছিন্ন বিছানায় শুয়ে পড়ে তখন সেই বিছানার মাঝে সে তার স্নেহময়ী মায়ের সুধামাখা বুকের স্পর্শ অনুভব করে। সারা দিনের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে সে এক অনাবিল তৃপ্তির মাঝে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

সেই মাতৃসমা সাতপুরুষের ভিটেমাটি অন্যের হাতে তুলে দিয়ে সে চলে যাবে, এটা সে ভাবতেও পারে না। তাই হরিহর মুখুজ্জের

কথায় সে আবার তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়—'মুখুজ্জেমশাই, আপনাকে তো আমি বলেই দিয়েছি—ও বাড়ি আমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারব না। যেখানে আমার সাতপুরুষ জন্মেছেন—যেখানে মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন—যার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে আমি পরিচিত—তাকে কোন মূল্যেই আমি অন্যের হাতে তুলে দিতে পারব না। এটাই আমার শেষ কথা। সাতদিন সময় দিলেও এর বাইরে আপনি আমার কাছ থেকে অন্য কোন জবাব পাবেন না।'

সাকরেদদের সামনে ভোলার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথায় হরিহর মুখুজ্জে নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে করল। প্রথমে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে ভোলার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় সমস্ত আক্রোশ তার ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছিল। তার শিরায় শিরায় যেন গলন্ত সীসার স্রোত বইছে। কপালের দুপাশের শিরা দুটো রাগে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। কিন্তু যাদের মুখে বিনয়ের হাসি আর অন্তরে কু-অভিসন্ধি তারা কখনও অপরকে চটিয়ে কথা বলবে না। হরিহর মুখুজ্জে সেই দলের লোক। সে নিজেকে সামলে নিল। ভেতরের গুমরে-মরা আক্রোশের কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটল না। ভোলাকে সে চেনে। চোখ রাঙিয়ে বা ভয় দেখিয়ে তাকে বাগে আনা যাবে না। লোকটা গরিব। কিন্তু ভিন্ন ধাতুতে গড়া। সে ভাঙবে তবু মচকাবে না। হরিহর মুখুজ্জেও শেয়ানা লোক। সে-ও ভাল করে জানে—সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুলটাকে একটু বাঁকিয়ে নিতে হয়। তার জন্যে মুখে হৈ-চৈ বাধিয়ে কোন লাভ নেই। ভোলা যখন মুখে একবার না বলেছে তখন তাকে দিয়ে হ্যাঁ বলানো অসম্ভব। সুতরাং তাকে অন্য লাইন চিন্তা করতে হবে। ভেতরে যতই আক্রোশ থাক না কেন মুখে একটা কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে ভোলার দিকে তাকিয়ে বলল—'শাবাশ্‌ ভোলা, তুমি বাহাদুর বটে। তুমি ঠিকই বলেছ। জন্মভিটে স্বর্গাদপী গরীয়সী। তাকে কি কেউ সহজে বিক্রি করতে চায়? তোমাকে শুধু বলা রইল। যদি

কখনও মনের পরিবর্তন হয় তাহলে আমাকে জানাবে।' তারপর নিজের সাকরেদদের দিকে তাকিয়ে মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বলল—'কি বল ঠিক বলিনি? ভোলা যখন রাজীই হচ্ছে না তখন ওর ওপরই ছেড়ে দিলাম। ও যা ভাল বুঝবে তাই হবে।' মুখুজ্জের কথায় তার সাঙ্গপাঙ্গ হৈ-হৈ করে তাকে সমর্থন জানাল। বাবুর সুরে সুর মেলানোই যে তাদের কাজ। কিন্তু মুখুজ্জের এটা আবার কী চাল—তাই ভেবে পরমুহূর্তেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিল।

দুষ্টবুদ্ধিতে হরিহর মুখুজ্জের মাথাটা ঠাসা। কখন কী পরিস্থিতিতে, কীভাবে সেই দুষ্টবুদ্ধির প্রয়োগ করতে হবে তা সে আগেই ঠিক করে নেয়। ভোলার ক্ষেত্রেও তার পরবর্তী কর্মপদ্ধতি সে এরই মধ্যে ঠিক করে ফেলেছে। ফন্দিটা মাথায় আসতেই মনে মনে সে একবার হেসে নিল। ভোলা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। হেসে তাকে বলল—'তুমি এস, ভোলা। এ ব্যাপারটা এখানেই শেষ। তোমার সাত পুরুষের ভিটে আমি আর নিতে চাই নে।' তারপর নিজের কণ্ঠে বৈরাগ্যের সুর এনে বলল—'আর কি-ই বা হবে! কদিনেরই বা এই দেওয়া-নেওয়া। আজ আছি, কাল নেই, এই তো জীবন!'

তারপর তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বলল—'চল হে, এবার ওঠা যাক। আমার আবার পুজো-আহ্নিকের সময় হয়ে এল।' বলেই সে অন্দরমহলের দিকে পা বাড়াল।

হরিহর মুখুজ্জের সম্পত্তি প্রচুর। কিন্তু ভোগ করার লোক নেই। তার বিবাহিত জীবনের প্রথম দশ বছরে কোন সন্তানের মুখ সে দেখেনি। কত ওঝা-ফকির, ঝাড়-ফুঁক, কত মাদুলি—কিন্তু কোন কিছুই তার স্ত্রীকে গর্ভধারণের ক্ষমতা এনে দিতে পারেনি। মুখুজ্জে সন্তানের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। কোন বিশেষ আশায় মানুষ যখন নিরাশ হয় তখন সে অন্য কোন নেশায় মেতে ওঠে।

হরিহর মুখুজ্জের অবস্থাও হয়েছিল তাই। পুত্রলাভের আশা যখন তার মিটল না তখন সে সম্পত্তির নেশায় মেতে উঠল। ছল-চাতুরি আর জাল-জোচ্চুরি করে দিনের পর দিন সে অন্যের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিজের সম্পত্তির কলেবর বৃদ্ধি করে এগিয়ে চলেছে। এ নেশা ভীষণ নেশা। পেছনে তাকাবার অবকাশ তার হয়নি। হঠাৎ যখন পেছনে দৃষ্টি পড়ল তখন দেখল তার সব শূন্য। তার অবর্তমানে এই বিশাল সম্পত্তি ভোগ করার লোক কোথায়? সে স্থির করল দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করবে। ঠিক সেই মুহূর্তে মা-ষষ্ঠীর কৃপা হল। সে জানতে পারল তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। চারদিকে আনন্দের রোল পড়ে গেল। হবু সন্তানের মঙ্গল কামনায় যাগ-যজ্ঞ পুজো-অর্চনা চলতে লাগল। তারপর একদিন সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্তান পৃথিবীর আলো দেখল। হরিহর মুখুজ্জে পুত্রের জনক হল।

সেই পুত্র আজ দশ বছর অতিক্রম করতে চলেছে। গ্রামের পাঠশালায় পড়া তার সাঙ্গ হয়েছে। হরিহর মুখুজ্জে জমিদার না হলেও —জোতদার তো বটেই। গ্রামে জ্ঞানী-গুণী অন্য লোক থাকলেও পয়সার জোরে সে সারা গাঁয়ের মাথা। ছেলেকে শহরে রেখে সে পড়াতে পারত। কিন্তু একটি মাত্র ছেলে। বাবা মায়ের নয়নের মণি। তাকে ছেড়ে থাকতে হবে এ তারা ভাবতেও পারে না। তাই গ্রামের স্কুলেই তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। তবে পড়াশুনার চেয়ে আড়ম্বর অনেক বেশি। ছেলের স্কুলে যাতায়াতের জন্যে ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে। ছেলের জন্য দুজন লোক বরাদ্দ করা হয়েছে। একজন ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়—আবার ছুটির পরে বাড়ি নিয়ে আসে। অন্যজন ছেলের টিফিন নিয়ে যায়—ছেলেকে খাইয়ে তারপর ফিরে আসে। স্কুলের দুজন শিক্ষককে বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন সকালে, অন্যজন সন্ধ্যায় এসে পড়িয়ে যায়।

মাঝে মাঝে হরিহর মুখুজ্জে মাস্টারকে জিজ্ঞেস করে—'কিহে

মাস্টার! কেমন বুঝছ? বংশের মান রাখতে পারবে তো?'

মাস্টার কী আর বলে? গ্রামের মুরুব্বি। যেমনটি উত্তর চায় তেমনটি বলাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। তাই মাথা চুলকোতে চুলকোতে কাষ্ঠহাসি হেসে জবাব দেয় 'তা আর বলতে! ছেলে আপনার হীরের টুকরো। যেখানে রাখবেন সেখানেই জ্যোতি ফুটে বেরুবে।.ও কি আর সাধারণ ঘরের ছেলে?'

মাস্টারের কথায় হরিহর মুখুজ্জে তৃপ্তির হাসি হাসে। আনন্দের আতিশয্যে মাস্টারের পিঠ চাপড়ে বলে—'তা যা বলেছ মাস্টার। ঐ কথাটা মনে রেখেই ওকে তৈরি করো। দু-পাঁচটা গাঁয়ের লোক যেন বলতে পারে—হরিহর মুখুজ্জের একটা ছেলে বটে!'

অপত্যস্নেহ এক ভীষণ বস্তু। স্নেহান্ধ পিতা-মাতার কাছে নিজ নিজ সন্তান অতুলনীয়। তারপর অন্য কেউ সেই সন্তানের সম্বন্ধে প্রশংসার বাণী শুনালে তো আর কথাই নেই, তখন কে যে পিতা আর কে যে পুত্র তা বোঝাই ভার। শিশুসুলভ অবান্তর মন্তব্য এবং বাচনভঙ্গি অনেক সময় পুত্র প্রশংসায় গর্বিত পিতা-মাতাকে সন্তানের স্তরে নামিয়ে আনে। হরিহর মুখুজ্জে তার পুত্রের মেধা সম্বন্ধে সচেতন। তবু মাস্টারের মুখে সেই পুত্রের প্রশংসাকে সত্যি-কারের প্রশংসার মাপকাঠিতে বিচার করে তার ছেলে দু-পাঁচটা গাঁয়ের মধ্যে সেরা ছেলে হতে পারে এমন ধারণাকে মনের মধ্যে স্থান দিতে দ্বিধা বোধ করেনি।

ছেলের বয়স হয়েছে। হরিহর মুখুজ্জে দেখল এবার ছেলের পৈতে দেওয়া দরকার। মুখুজ্জে পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী, তার উপনয়ন। সে তো এক বিরাট ব্যাপার, শহর থেকে নাম-করা পণ্ডিতের ডাক পড়ল। পঞ্জিকা দেখে সব কিছু বিচার করে শুভদিন ঠিক করতে হবে। পণ্ডিতেরা ছক কেটে ঠিকুজি নিয়ে দিন স্থির করতে বসলেন। সেই দিন থেকেই বাড়িতে বেশ একটা উৎসব-উৎসব আমেজ শুরু হয়ে গেল। লোকজনের আনাগোনা, আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতি সব মিলিয়ে বাড়িতে একটা হৈ-হৈ পরে গেল। শহরের

নাম-করা যাত্রা-পার্টির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। তিনটে দল আসবে। পরপর তিনদিন যাত্রা হবে। এক-একদিন এক-এক পালা। লোকজন নিয়ে শহরের নামজাদা ডেকরেটর কোম্পানী এসে গেছে। নাটমন্দিরের পাশে বিরাট শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। নানা সুদৃশ্য রংয়ের কাপড়ে শামিয়ানা তৈরি, রংয়ের অপূর্ব কম্বিনেশন। বাড়ির দরজায় বিরাট বিচিত্র গেট তৈরি হয়েছে, সঙ্গে নহবতখানা। সোনারপুর কেন—পাশাপাশি কোন গ্রামের কারও উপনয়নে যা কোনদিন হয়নি—হরিহর মুখুজ্জে তার পুত্রের উপনয়নে তাই করে দেখাতে চাইছে।

নির্দিষ্ট দিনে হরিহর মুখুজ্জের একমাত্র পুত্র দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হল। আর সেই উপলক্ষ্যে গ্রামশুদ্ধ লোক বাড়িতে নিমন্ত্রিত। অন্দরমহল আর বাহির মহল আত্মীয়-স্বজনে আর নিমন্ত্রিত অতিথিতে গিজ-গিজ করছে, ভোলাও নিমন্ত্রিত। হরিহর মুখুজ্জে নিজে তাকে নিমন্ত্রণ করেছে। শুধু অনুষ্ঠানের দিন নয়। অনুষ্ঠানের পূর্ব থেকে শুরু করে পুরো এক সপ্তাহ তার খাওয়া-দাওয়া মুখুজ্জে বাড়িতে।

অনুষ্ঠানের পরের দিন থেকে রাতে যাত্রার আসর বসবে। পর পর তিনদিন। প্রথম দুদিন শেষ হয়ে গেছে। তৃতীয় দিন রাত নটা নাগাদ যাত্রার প্রথম কনসার্ট বাজল। হ্যাজাকের আলোতে যাত্রার আসর ঝলমল। "বঙ্গে বর্গী" পালা হবে। পাশাপাশি তিন-চারখানা গাঁয়ের লোক জড় হয়েছে। আসর জমজমাট। মাঝখানে চৌকি পেতে ডায়াস তৈরি হয়েছে। তার চারদিকে দর্শকদের চট পেতে বসানো হয়েছে। একটা দিক মহিলাদের জন্য চিহ্নিত। আর একটা দিকে বাঁশ বেঁধে যাত্রার লোকদের যাওয়া-আসার জন্য পথ করে দেওয়া হয়েছে।

হরিহর মুখুজ্জের নির্দেশে ভোলা অন্যান্যদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আসর ম্যানেজ করতে ব্যস্ত। যাত্রা বেশ জমে উঠেছে। ঘন ঘন হাততালি পড়ছে। হঠাৎ হরিহর মুখুজ্জের তিন বিঘাওয়ালা বাড়ির সীমানা পেরিয়ে একটা লেলিহান অগ্নিশিখা বেশ কিছু

দর্শকের নজরে এল। 'আগুন' 'আগুন' বলে চিৎকার করে কিছু লোক যাত্রার আসর থেকে বেরিয়ে গেল। অন্যরাও উঠে দাঁড়াল। আসরে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সাময়িকভাবে যাত্রাও বন্ধ রাখতে হল।

বেশ কিছু দর্শক যখন হৈ-হৈ করে ঘটনাস্থলে যেয়ে পেঁছিল তখন ছন্ আর বাঁশের তৈরি কুঁড়েঘরটি সম্পূর্ণরূপে অগ্নিদেবের বহ্নি কবলিত। প্রজ্বলিত লেলিহান শিখা তখন সমস্ত ঘরটিকে গ্রাস করে নিয়েছে। তখন আর কিছুই করার নেই। ঘরের চালা ভেঙে পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে। সমগ্র দর্শকমণ্ডলী অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। তারই মধ্যে দু-চারজন আগুন নেভানোর জন্য নিরর্থক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই সব শেষ। তখন শুধু অর্ধদগ্ধ বাঁশের খুঁটিগুলো ধিকিধিকি করে জ্বলছে।

যারা তাকে জানে তারা দুঃখ প্রকাশ করে বলল—'ভোলাটা সত্যি সত্যি ঘর-ছাড়া হল।' আর যারা ভোলাকে চেনে না তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে পুনরায় যাত্রার আসরের দিকে রওনা হল। যাত্রা আবার শুরু হবে। লোকজন ফিরে এলে সকলে আবার যে যার জায়গায় বসে পড়ল। নতুন করে আবার কনসার্ট বাজল।

কনসার্ট শেষ হলে হরিহর মুখুজ্জে চৌকি পাতা ডায়াসের ওপর এসে দাঁড়াল। যতটা সম্ভব নিজের চোখে মুখে একটা কৃত্রিম ভাবাবেশ এনে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলল—'আপনাদের এই আনন্দ মুহূর্তে যে-অঘটন আজ ঘটে গেল তার জন্য আমরা অতীব দুঃখিত। আপনারাও আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, এই দুর্ঘটনায় যার যথাসর্বস্ব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল—সেই হতভাগ্য ভোলাকে সান্ত্বনা জানাবার মতো কোন ভাষা আমাদের নেই। তার প্রতি আমাদের সকলের সমবেদনা জানিয়ে আমরা আবার আপনাদের সামনে অসমাপ্ত যাত্রার

বাকি অংশটি উপস্থিত করছি।'

হরিহর মুখুজ্জে ডায়াস থেকে নেমে এলে আবার যাত্রা শুরু হল। কিন্তু ভোলাকে আর যাত্রার আসরের কোথাও দেখা গেল না।

নিজের ঘর পুড়ে যেতে দেখে ভোলা সেই যে যাত্রার আসর থেকে দৌড়ে এসে নিজের উঠোনের পাশে দাঁড়িয়েছিল আর সে সেখান থেকে নড়েনি। নিজের শেষ সম্বলটুকু সর্বগ্রাসী আগুনের কবলে কিভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাই প্রত্যক্ষ করতে লাগল। তারপর আগুনের শেষ শিখাটি মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে সেখানে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। তার অবচেতন মনে একটা প্রশ্নই শুধু বারবার দেখা দিতে লাগল —'আমি তো সজ্ঞানে কোনদিন কারও প্রতি কোন অন্যায় করিনি, কারও কোন ক্ষতিও করিনি। তবু আমার প্রতি এ নিষ্ঠুরতম আঘাত হানা হল কেন?'

এ প্রশ্নের জবাব ভোলা সেদিন পায়নি। কারণ অশিক্ষিত সরল-প্রাণ ভোলা জানে না আজকের এ সংসার বড় জটিল। এখানে তার মতো নিরাসক্ত ও উদাসীন লোকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। অথচ হরিহর মুখুজ্জের ন্যায় বিত্তলোভী আর স্বার্থান্বেষীর সংখ্যায় সমাজ আজ ভরে উঠেছে।

হরিহর মুখুজ্জের বাড়ির যাত্রা আবার শুরু হয়েছে। ভোলা আর সেদিকে গেল না। যাত্রার আসরের হ্যাজাকের আলোগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেই আলো-আঁধারের মাঝে ভোলা আরও কিছুক্ষণ পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। সে তার আরাধ্য দেবতার কাছে কোন অভিযোগও জানাল না, কারও প্রতি কোন অভিশাপের বাণীও উচ্চারণ করল না। কেবল যাত্রার আসরে টাঙানো হ্যাজাক-গুলোর বিচ্ছুরিত আলোর দিকে একবার তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে গ্রামের মেঠো পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে সেই অভিশপ্ত রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একসময় মিলিয়ে গেল।

ভোলার সেই ছন্নছাড়া গতিহীন জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়

শুরু হল। এতদিন সে তার পিতৃপুরুষের ভিটায় তাঁদেরই তৈরি কুঁড়ে ঘরটিকে সম্বল করে 'স্বর্গাদপী গরিয়সী' জন্মস্থানকে আঁকড়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ সে গৃহহীন, ঘরছাড়া। নতুন করে ঘর বাঁধার তার সঙ্গতি নেই—কাজেই আগ্রহও নেই। কারণ সে জানে তার ঘর যখন একবার পুড়েছে তখন নতুন করে আর একটা কুঁড়েঘর বাঁধলেও তা আবার পুড়বে। তাই তালপাতার ছাউনি দিয়ে সে কেবলমাত্র দুমুঠো চাল সিদ্ধ করে নেওয়ার মতো একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। দিনমজুরি খেটে বেলা দুটো-তিনটে নাগাদ সে ফিরে আসে। দুটো ডাল-ভাত করে খেয়ে নেয়। কোন কোনদিন বিকেলের দিকে ছেঁড়া মাদুরটা "সিঁদুরে" আমগাছটার তলায় বিছিয়ে একটু গড়াগড়ি দেয়। গাছের ডালে পাতার ফাঁকে বসে দোয়েল পাখি শিষ দেয়—ডালে ডালে ফিঙে নাচে। সব মিলিয়ে অপরাহ্নের পড়ন্ত বেলাটা তার কাছে মধুর হয়ে ওঠে। কোন কোনদিন আর বিশ্রাম করে না। খাওয়া সেরেই সোজা বেরিয়ে যায়।

ঘোষালরা ভোলাকে ভালবাসে। তাদের হরিসভার এককোণে ছোট একটা ঘরে ভোলার রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রাত্রের রান্নার পাট ভোলা তুলে দিয়েছে। মুড়ি কিংবা রুটি খেয়ে সে রাত কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে ঘোষালরা ডেকে ভোলাকে রাতের খাবার খাওয়ায়। ঘোষালদের এই আন্তরিকতা কেমন যেন একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তি আর অপরাধবোধ তার দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একদিকে হরিহর মুখুজ্জে আর একদিকে অজিত ঘোষাল। একজন শয়তানের প্রতিমূর্তি আর একজন মানবদেহী দেবতা। মানুষে মানুষে যে এত তফাৎ সেটা তার আগে এমনভাবে জানা ছিল না। সুসময়ে মানুষ চেনা যায় না। অসময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই সত্যিকারের মানুষ বেছে নেওয়া সম্ভব।

ভোলা গরিব। সে জানে হরিহর মুখুজ্জের সব অত্যাচার অবিচার তাকে মুখ বুজে চুপচাপ হজম করে যেতে হবে। তবু

নিজের ভিটের পাশে দাঁড়িয়ে সে যখন তার পোড়া মাটির দিকে তাকায় তখন তার অজান্তেই নানারকম চিন্তা নিজের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনটা যেন কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু ইদানীং সে একটা সত্য আবিষ্কার করেছে। সন্ধ্যাবেলায় যখন ঘোষালদের হরিখেলার বাঁধানো চাতালে বসে সে হরিকীর্তন শোনে বা আরতি দেখে তখন তার মনটা আবার আগের মতো চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। তাই রাধা-কৃষ্ণের রাতুল চরণে নিজেকে সমর্পণ করে সে পার্থিব শোক-তাপ আর চিন্তার হাত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

ছেলের উপনয়নের পর প্রায় দুমাস গত হতে চলল তবু ভোলার পৈত্রিক বাড়িটা হরিহর মুখুজ্জে কিছুতেই করায়ত্ত করতে পারছে না। এটা তার কাছে একটা বিরাট পরাজয়। নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে সে গাছ-পালা-ঢাকা ভোলার বাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে—আর কী যেন ভাবে। ঘর পুড়ল, বাড়িহারা হল—তবু কিছুতেই ব্যাটা পথে আসছে না, অন্যের বাড়িতে রাতের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সেই পোড়া ভিটেটা তবু আঁকড়ে থাকা চাই। কিছুতেই হাতছাড়া করবে না।

হরিহর মুখুজ্জে ভোলা ছাড়া আর কারও কাছে কোনদিন এমন ভাবে জব্দ হয়নি। কিছুতেই এই পাগলটাকে সে আজও বশে আনতে পারল না। ভয় দেখিয়ে প্রলোভনের পথে টেনে এনে—এমন কি, ঘরে আগুন লাগিয়েও এই সামান্য একটা দীন-মজুরকে সে তার ইচ্ছার স্বপক্ষে কোন কথাও বলাতে পারল না। তাই অন্য কোন উপায়ে ভোলার বাড়িটা নিজের সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত করা যায় কিনা তারই একটা নতুন প্ল্যান মাথায় এনে এবং সেই প্ল্যানটা কীভাবে কাজে লাগানো যায় সেটাই তার মাথায় এখন ঘুরপাক খেতে থাকল।

সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই পবিত্র দিনটিতে ঘোষালদের বাড়িতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও হরি-সংকীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধ্যার আগে থেকেই বহুলোক তাদের হরিমন্দিরের বাঁধানো

চাতালে এসে জড় হয়েছে। সন্ধ্যারতি শেষ হলেই কীর্তন শুরু হবে।

অপরাহ্ণ বেলায় মেঘনার পাড় ধরে ভোলা এগিয়ে আসছিল। হয়ত ঘোষালদের বাড়িতে আজ একটু তাড়াতাড়িই সে যেতে চায়। কীর্তনের আসর বসবে সেখানে।

বিকালের সূর্যটা গড়িয়ে গড়িয়ে পশ্চিমাকাশে অনেকটা নেমে পড়েছে। ঈশান কোণে একখণ্ড কালোমেঘ কখন যেন সবার অলক্ষ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। দ্রুত কলেবর বৃদ্ধি করে সেই কালো মেঘ দেখতে দেখতে সমগ্র উত্তর পশ্চিম কোণটা ছেয়ে ফেলল। চার-দিকে একটা নিস্তব্ধ থমথমে গুমোটে ভাব। কোথাও একটু হাওয়ার চিহ্ন নেই, গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। মাঝে মাঝে কালো মেঘের গা চিরে আঁকা-বাঁকা বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। আর লাগাতার একটা গুমগুম আওয়াজ সেই ঘন কৃষ্ণমেঘের আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠল। ঈশান কোণের সমস্ত পুঞ্জীভূত কালো মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে সমস্ত আকাশ ভরিয়ে দিল। রূপসী বাংলার চির-পরিচিত কাল-বৈশাখীর পূর্বাভাস নিথর প্রকৃতির আকাশে বাতাসে ফুটে উঠল।

আকাশে মেঘ দেখে ময়ূর যেমন আনন্দে পেখম মেলে নৃত্য করে, তেমন মেঘ দেখে মেঘনার জলেও প্রলয় নৃত্য শুরু হয়ে যায়। উথালি-পাথালি ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে। ঢেউয়ের প্রচণ্ড আঘাতে মেঘনার পাড় ভেঙে জলের গভীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, এখনই হয়তো প্রচণ্ড ঝড় উঠবে।

হরিহর মুখুজ্জে ছেলেকে নিয়ে মেঘনার পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দু-চারজন সঙ্গী সর্বদাই তার সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ঘুরে বেড়াত। সে-দিনও ছিল। ছেলেটি নদীর পাড়ে দামাল ছেলের ন্যায় এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, কখনও কাছে কখনও বা দূরে। ঝড় ওঠার সেই মুহূর্তটিতে সে হরিহর মুখুজ্জের কাছ থেকে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে। সে চিৎকার করে ছেলেকে চলে আসতে বলল। এখনই

বাড়ি ফিরতে হবে।

আকাশের অবস্থা দেখে ভোলাও দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছিল। তার সামনে বেশ কয়েক গজ দূরে হরিহর মুখুজ্জের ছেলে।. বাবার ডাক শুনে সেও ছুটতে শুরু করল। কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড় ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। ছেলেটা তখনও বাবার কাছে এসে পেঁছিতে পারেনি। মেঘনার বুক থেকে একটা প্রচণ্ড ঢেউ তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। বাসুকি যেন তার বিশাল ফণা বিস্তার করে দুর্বার গতিতে ধরিত্রীকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। হরিহর মুখুজ্জের ছেলেটি যেখান দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ঠিক সেই বরাবর প্রলয়ংকরী ঢেউটা প্রচণ্ড বেগে তীরে এসে আছড়ে পড়ল। বিচ্ছুরিত জলের সাদা ফেণা বেশ কিছুটা জায়গায় একটা ধোঁয়াটে পরিবেশ সৃষ্টি করল।

ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় তীরের নিচের অনেকটা অংশ ধসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরের অংশটায় এক বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হল। হরিহর মুখুজ্জের ছেলে পড়ল সেই ফাটলের গণ্ডীর মধ্যে। চোখের নিমেষে ভীষণ এক শব্দ করে সেই ফাটল-ধরা পাড়টি হরিহর মুখুজ্জের ছেলেকে নিয়ে মেঘনার জলে আছড়ে পড়ে মিলিয়ে গেল।

হরিহর মুখুজ্জে সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে পাগলের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠল—'বাঁচাও, বাঁচাও! আমার ছেলেকে বাঁচাও!' হরিহর মুখুজ্জের সঙ্গীরাও হাহাকার করে উঠল—'গেল, গেল! ছেলেটা নদীর জলে ডুবে গেল! কে কোথায় আছ বাঁচাও বাঁচাও।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ভোলা পাগলের মতো ছুটে এসে সেই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ প্রলয়ংকরী মেঘনার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছেলেটা তলিয়ে যাচ্ছিল। ভোলা একহাতে তাকে জাপটে ধরল। তারপর বহু কষ্টে সেই উদ্বেলিত জলরাশির মাঝে এক হাতে সাঁতার কেটে তীরের কাছে এসে পেঁছিল। দুর্বল পায়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে ছেলেটিকে দুহাতে ওপরে তুলে ধরল।

হরিহর মুখুজ্জের সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি ছুটে এল। তারপর উবু

হয়ে ছেলেটির হাত ধরে টেনে ওপরে তুলে নিল। ছেলেটিকে তুলে নিয়ে তারা বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছে। কিন্তু ভোলার কথা একবারও তাদের মনে এল না। হরিহর মুখুজ্জেও 'হায় ভগবান, হায় ভগবান' করতে করতে ছেলের দিকে ছুটে গেল। সেও একবার ভোলার দিকে তাকিয়ে দেখল না।

এদিকে ভোলা তার দুর্বল হাতদুটো দিয়ে পাড়ের মাটি আঁকড়ে ধরে ওপরে উঠতে গেল।

কালবৈশাখীর ঝড় সোঁ-সোঁ করে বয়ে চলেছে। হঠাৎ আর একটা ঢেউ এসে প্রবল বেগে তার গায়ে আছড়ে পড়ল, সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। দুর্বল হাতে-ধরা পাড়ের মাটি ভেঙে তার হাত ফসকে গেল। সে আবার জলে গড়িয়ে পড়ে গেল। নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। জলের প্রচণ্ড টানে তার শীর্ণ দুর্বল দেহটাকে মেঘনার তরঙ্গায়িত অথৈ জলে চকিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সমস্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে ভোলার নশ্বরদেহটা সেদিন রাক্ষসী মেঘনার অতল সলিলে চিরদিনের মতো মিলিয়ে গেল।

মানুষের ঘটনা বহুল জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটে যায় সবগুলো মানুষের মণিকোঠায় তেমন রেখাপাত করতে পারে না। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা আছে যা মানুষের মনকে অতি সহজেই দোলা দেয়—তাকে নতুন চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ করে। ভোলা কয়ালের এই আত্ম-দানের ঘটনাটি হরিহর মুখুজ্জের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। ঘর পুড়িয়ে গৃহহারা করে যার সম্পত্তি সে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল সেই ভোলা কয়াল তার নিজের জীবনের বিনিময়ে তার ছেলের জীবন রক্ষা করল। এটা চিন্তা করতে যেয়ে হরিহর মুখুজ্জে সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে ফেলে।

অশান্ত মন নিয়ে হরিহর মুখুজ্জে একদিন সদর শহরে চলে এল। আইনজীবিদের সঙ্গে পরামর্শ করল। বে-ওয়ারিশ সম্পত্তি সরকারের খাস সম্পত্তি। ভোলা কয়ালের সেই খাস সম্পত্তি একদিন হরিহর মুখুজ্জে বেশ চড়া দামে কিনে নিল—ঢেঁড়া পিটিয়ে আশপাশের

গ্রামগুলিকে জানিয়ে দিল—প্রতি সপ্তাহে দুদিন—মঙ্গলবার আর শনিবার সোনারপুর গ্রামে হরিহর মুখুজ্জের বাড়ির দরজায় হাট বসবে। সে নিজের টাকায় জায়গাটাকে হাটের উপযোগী করে তৈরি করল। কিছু কিছু দোকানপাটও নিজের পয়সায় তৈরি করে দিল। দু-এক মাসের মধ্যেই হাট বেশ জমে উঠল। দূর দূর গ্রাম থেকে বহু লোক সেখানে বেচা-কেনা করতে আসে।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, হরিহর মুখুজ্জের নিজের তদারকিতে বিরাট এক সাইনবোর্ড হাটে ঢোকার মুখে দুপাশে দুই সুন্দরী-কাঠের খুঁটি পুতে উঁচু করে টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাইন-বোর্ডটার গায়ে বড় বড় সুন্দর হরফে লেখা রয়েছে—'ভোলা কয়ালের হাট।'

জীবদ্দশায় অতি সাধারণভাবে বেঁচে থাকার সামান্যতম অধিকারটুকুও যাকে দিতে হরিহর মুখুজ্জে রাজী ছিল না, মরণের ভেতর দিয়েই সে আজ অমর হয়ে রইল।

* * *

জীবন দিয়ে জানা

মাতৃহারা গোপাল যেদিন পিতৃহারা হয়ে শ্মশানে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে বাড়ি ফিরে এল সেদিন তার ছ'বছরের আদুরে বোনটি ছাড়া নিজের বলতে আর কেউ রইল না। গোপাল জন্মান্ধ। সে-ও সবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছে। যতদিন বাবা বেঁচে ছিল ততদিন সংসার সম্বন্ধে তার কোন ভাবনা ছিল না। বাবা যে-ভাবেই হোক, দিন-মজুর খেটে বা অন্য উপায়ে যা উপার্জন করত তা দিয়েই তিনটি প্রাণীর কোন রকমে দিন কেটে যেত। কিন্তু পিতার অবর্তমানে নিজের এবং ছোট বোনটির সমস্ত দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসে পড়ল। একে জন্মান্ধ তার ওপর কপর্দক-শূন্য। প্রথম প্রথম প্রতিবেশীরা কিছু কিছু সাহায্য করত। তা দিয়ে কোন রকমে দুটো হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা হত। কিন্তু অতি নগণ্য অনুন্নত গ্রাম। প্রতিবেশীরাও গরিব। তাদেরও নুন আনতে পান্তা ফুরায়—এই অবস্থা। কাজেই গুরুদশা শেষ হবার পূর্বেই আস্তে আস্তে তাদের সাহায্যও প্রায় বন্ধ হতে চলল। পাশের বাড়ির পদ্ম-পিসি। সেও গরীব। গোপালকে সে ভীষণ স্নেহ করে। লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে আর যতটা পারল নিজে সাহায্য করে গোপালকে গুরুদশার হাত থেকে মুক্ত করল।

এতদিন অশৌচ অবস্থায় অনেকেই তার প্রতি দয়া দেখিয়েছে। কিন্তু এখন গোপালকে নতুন করে কিছু ভাবতে হবে। নিজের জন্য গোপাল ভাবে না। ভিক্ষা করে হোক বা যে করেই হোক চলে যাবে। কিন্তু বোনটা বড় আদরের। তাকে নিয়েই গোপালের যত ভাবনা। কী করে নিজেদের দু-মুঠো অন্নের সংস্থান করা যায় সেটা সে কিছুতেই ভেবে উঠতে পারে না।

কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতে পারলেও কে তাকে কাজ দেবে?

সে যে অন্ধ। একমাত্র ভিক্ষা করা ছাড়া সে বাঁচার আর কোন পথ খুঁজে পেল না। ভিক্ষাই তাকে করতে হবে। তাই পরের দিন সকালে উঠে পদ্মপিসির বাড়ি গেল। সেখান থেকে ফিরে একটা ঝোলা নিয়ে সে বেরিয়ে পরার মনস্থ করল। বেরবার আগে বোনকে কোলে নিয়ে আদর করল। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহের সুরে বোনকে বলল—'আমি বাইরে যাচ্ছি, না ফেরা পর্যন্ত ঘর থেকে কোথাও যাবে না কিন্তু, আমি পদ্মপিসিকে বলে এসেছি। সে মাঝে মাঝে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলে যাবে।' দাদার আদরে সে আরও নিবিষ্ট হয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে। তারপর কাঁধের উপর মুখ লুকিয়ে দাদাকে আশ্বস্ত করে—'তুমি কিছু ভেব না দাদা। আমি কোথাও যাব না, ঘরে বসেই খেলা করব।'

বোনকে কোল থেকে নামিয়ে ঘরের বেড়ার গায়ে ঠেস দেওয়া লাঠিটা তুলে নিয়ে সেটাকে ঠুকতে ঠুকতে পথের নিশানা ঠিক করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

গোপালের অভিশপ্ত জীবনের আজ এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। এর পূর্বে সে কোনদিন তার আদরের ছোট বোনকে এভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রেখে বাড়ির বাইরে যায়নি। মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

বোনও কোনদিন এ অবস্থায় বাড়িতে থাকেনি। সেও হাপুস নয়নে দাদার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালে মানুষ বয়সের তুলনায় বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করে। ছ'বছরের শিশু আজ দারিদ্র্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এটা সুস্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে, আর পাঁচজনের ন্যায় দুটো ভাত খেয়ে ক্ষুধা মেটানোর মতো দু-মুঠো চালও তাদের ঘরে নেই। অন্ধ দাদা তারই ব্যবস্থা করতে তাকে একলা এভাবে রেখে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। নিজের অজান্তেই তার দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

হঠাৎ সে দেখল তার দাদা আবার হাতের লাঠিটা রাস্তায় ঠুকতে ঠুকতে বাড়ির দিকে ফিরে আসছে। সে দৌড়ে গিয়ে দাদার হাত

ধরল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো মুছে নিয়ে দাদাকে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি আবার ফিরে এলে কেন, দাদা ?'

গোপাল নিচু হয়ে চালাঘরের বারান্দায় উঠতে উঠতে বলল—'বড় ভুল হয়ে গেছে রে! ঘরের মাচায় কিছু মুড়ি রেখেছি। তোকে খেতে দিতে ভুলেই গেছি।' তারপর নিজের কথাটাকে ঘুরিয়ে অন্য-ভাবে বলল—'সকালে আমি খেলাম, অথচ তোকে দিতে একদম ভুলে গেছি। মাচা থেকে মুড়ি এনে দিচ্ছি, তুই ওগুলো খেয়ে নে। আমার ফিরতে তো দেরি হবে। এসে তবে রান্না করব। অনেক দেরি হয়ে যাবে। ততক্ষণে তোর ভীষণ খিদে পেয়ে যাবে '

কাল সন্ধ্যায় পদ্মপিসি এক বাটি মুড়ি দিয়েছিল। বোনকে খাইয়ে বাকিটা রেখে দিয়ে তাকে গোপাল বলেছিল—'তুই এবার ঘুমিয়ে পর। আমি পরে খেয়ে নেব।'

বোন ঘুমিয়ে পড়লে তা থেকে দুমুঠো মুখে দিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে সে রাতের খাওয়া শেষ করেছিল। বোনকে সকালে কিছু খেতে দিতে হবে তাই নিজে না খেয়ে বাকিটা সে ঘরের মাচায় তুলে রেখে-ছিল। সেটাই নামিয়ে বোনকে খেতে দিল। বোন দাদাকে না দিয়ে খাবে না, তাই কথাটা ঘুরিয়ে গোপাল বোনকে জানিয়ে দিল যে, সে সকালে মুড়ি খেয়ে নিয়েছে। তবু বোনের আবদারে সে তা থেকে একমুঠো না নিয়ে পারল না। এক মুঠো মুখে পুরে বোনকে আর একবার আদর করে সে লাঠি হাতে মুড়ি চিবতে চিবতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এল গোপাল। ভিক্ষে করে প্রথম দিনে ভালই পেয়েছে। সের দুয়েক চাল, কিছু আলু ও অন্যান্য সবজি এবং বেশ কিছুটা নগদ পয়সাও পেয়েছে—প্রায় টাকা দুয়েকের মতো। প্রথম দিন, তার ওপর অন্ধ। পাশের গাঁয়ের লোকদের অবস্থাও কিছুটা ভাল। তাই প্রথম দিনে সকলেই নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সেই হতভাগ্য অন্ধ গোপালের ভিক্ষার ঝুলিতে কিছু দেবার সময় এতটুকু কার্পণ্য করেনি।

পদ্মপিসি এরই মধ্যে বার দুয়েক এসে খোঁজ নিয়ে গেছে। এবার বাড়ির উঠোনে এসে হাঁক দিল—'গোপাল এলি নাকি রে?'

পিসির গলা শুনে গোপাল ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে উত্তর দিল—'হ্যাঁ, পিসি।' তারপর দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে বলল—'তুমি একটু ভেতরে এস তো পিসি। ঝোলার মধ্যে চাল সবজিগুলো রয়েছে। তুমি একটু ওগুলো ঠিকঠাক করে রাখ।'

পদ্মপিসি শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে ঘরে এসে ঢুকল। বলল, 'ও সব আমি গুছিয়ে রাখব খন।' তারপর ভিক্ষালব্ধ জিনিসগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে বলল—'এগুলো এখন এভাবেই থাক। আমি উনুনটা ধরিয়ে আলু সেদ্ধ ভাত করে দিচ্ছি। আমি ডাল রান্না করেছি, তা থেকে একবাটি তোদের জন্য রেখে দিয়েছি, তুই বরং একটু বিশ্রাম করে স্নান করে আয়, এর মধ্যে আলুসেদ্ধ ভাত হয়ে যাবে। তোদেরকে খাইয়ে-দাইয়ে এগুলো আমি পরে গোছগাছ করে রাখব।'

পিসির কথায় গোপাল আপত্তি জানিয়ে বলল—'না পিসি, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। সকাল থেকে তুমি তো আর বসে নেই। ও সামান্য আলুসেদ্ধ ভাত আমিই করে নিতে পারব।'

কিন্তু পরোপকার করা যাদের স্বভাব নিজেদের শ্রম তাদের কাছে অতি তুচ্ছ। পদ্মপিসিও তাই গোপালের কথায় কান দিল না। একটা আধ-ভাঙা এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে কিছুটা চাল আর দুটো আলু তুলে নিয়ে বলল—'তাতে কি হয়েছে রে? তোর পিসে-মশাই মাঝে মাঝে বলতেন—আমি নাকি দিনরাত খেটে যাচ্ছি। কিন্তু আমি তো শরীরে কোন ক্লান্তি বুঝতে পারি না। বরং বেশ ভালই লাগে। মানুষের, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হলে কর্তব্য প্রচুর। আমি তো বুঝতেই পারছি না সব কর্তব্য আমার করা হচ্ছে কিনা। আমরা মায়ের জাত। গতর খাটিয়ে তোদের আদর-যত্ন করাই তো আমাদের কাজ। ও তুই কিছু ভাবিস না। আমি সব

ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। রোজ তো আর এতটা পারব না।' বলেই সে পাত্রটা নিয়ে উনুনের পাশে চলে গেল।

প্রথম প্রথম কয়েক দিন ভিক্ষা করে গোপাল ভালই যোগাড় করত। কিন্তু চোখে দেখতে পায় না, নতুন নতুন গ্রামে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নির্দিষ্ট কয়েকটা এলাকাতেই সে ঘুরে-ফিরে ভিক্ষে করতে যায়। একই লোককে একদিন বা দুদিন অন্তর ভিক্ষে দিতে হয় বলে স্বাভাবিক কারণেই দাতার দানের পরিমাণ কমে আসে। তাই সে এখন আর তেমন ভিক্ষা পায় না। যা পায় তা দিয়ে কোন ক্রমে কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে যায়।

তার ওপর আজ তিন দিন থেকে বোনটার জ্বর। সকালের দিকে জ্বরটা কমের দিকে থাকে। দুপুর হলেই বাড়তে শুরু করে। বাড়তে বাড়তে একশো চার পাঁচ-এ গিয়ে দাঁড়ায়। প্রথম দুদিন পদ্মপিসি বোনের ভার নিয়েছিল। তার-ও ফুরসৎ নেই। অন্যের বাড়ির ধান এনে সেদ্ধ করে শুকানো। তারপর সেই ধান ঢেঁকিতে ছাঁটা, কারও কাঁথা শেলাই করে দেওয়া—এতে যা পায় আর বাড়ির ফলটা-মূলটা বিক্রি করে তার দিন চলে। তবু এরই মধ্যে দুদিন অসুস্থ মেয়েটাকে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছে। বলেছে—'গোপাল, তুই বেরিয়ে পড়। মনাকে আমি আমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, তোর কোন চিন্তা নেই।' কিন্তু আজ যেন জ্বরটা একটু বাড়াবাড়ির দিকে। রাতের দিকে জ্বরটা প্রচণ্ড রকম বেড়েছিল। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছিল। সকাল থেকে চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে আছে।

পদ্মপিসিই এসে গোপালকে বলল—'তোর আজ বেরনোর দরকার নেই। তুই মনার কাছে বস। আমি দেখি গোবিন্দ কোবরেজকে একবার ডেকে নিয়ে আসি।'

কবিরাজমশাই এলেন। মনার বিছানার পাশে বসলেন। চোখ বুজে নাড়ি টিপে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন। তারপর নাড়ি ছেড়ে পদ্মপিসিকে বললেন—'তোমরা একজন আমার সঙ্গে এস। ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

গোপালকে মনার পাশে রেখে পদ্মপিসিই কবিরাজমশায়ের সঙ্গে গেল। তাঁর তিনটাকা ফি এবং চারটাকা ওষুধের দাম পদ্ম-পিসিই মিটিয়ে দিয়ে ওষুধ নিয়ে এল।

তিনদিন ওষুধ খেয়েও জ্বরের কোন পরিবর্তন হল না। বরং অবস্থা আরও খারাপের দিকে বাঁক নিয়ে চলেছে। পদ্মপিসি ও গোপাল দুজনেই ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। হাতে পয়সা নেই যে পাশকরা ডাক্তার এনে দেখাবে।

বাবার অকালমৃত্যুটা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো গোপালের জীবনের সমস্ত কিছুকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কয়েক মাসে সেই শোকটাকে সে অনেকটা সামলে নিয়েছিল। কিন্তু বোনের এই অসুস্থতা তার সামনে আবার নতুন করে এক বিরাট সমস্যা এনে দিল। তার হতভাগ্য জীবনে এ যেন আর এক নতুন চ্যালেঞ্জ। সে কীভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না।

বাবার জীবদ্দশায় তাকে সে বলতে শুনেছে—'আমরা এখন স্বাধীন। দেশের সরকার আমাদের। আমাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা এখন তাঁরাই করবেন। আমাদের বিপদে-আপদে তাঁরাই আমাদের দেখবেন।'

মাথার ওপর আচ্ছাদন থাকলে ঝমঝম বৃষ্টি যেমন পুলকদায়ক বলে মনে হয়—বাবা বেঁচে থাকা পর্যন্ত এ কথাগুলোও তার কাছে তেমনি পুলকদায়ক বলে মনে হত। কিন্তু বাস্তবের সংস্পর্শে এসে সে বুঝতে পেরেছিল যে সেই গালভরা কথাগুলো কেবল ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, জাতীয় সরকার—অতশত গোপাল বোঝে না। তবে নিজের অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে এটা আজ তার কাছে পরিষ্কার যে, তার মতো একটা অন্ধ অসহায় বালকের আকুল আকুতি স্থানীয় কোন রাজনৈতিক নেতার মনে কোন রেখাপাত করতে পারবে না। তবু আর কোন উপায়ান্তর না

দেখে সে পদ্মপিসিকে বলল—'পিসি, তুমি মনার কাছে থাক। আমি একবার পাশের গাঁয়ে দীনবন্ধুবাবুর কাছে যেয়ে দেখি। তিনি তো এ তল্লাটের পঞ্চায়েতের বড়বাবু, যদি বোনটার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।'

গোপাল দীনবন্ধুবাবুর কাছে গেল। কিন্তু তিনি শ্রুতিমধুর কিছু উপদেশ ছাড়া গোপালকে আর কিছুই দিতে পারলেন না।

তিনি গোপালকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—'চিন্তার কোন কারণ নেই, গোপাল। এ সব ব্যাপারে আমাদের স্বস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে সেলিমপুরে। মাত্র ক্রোশ তিনেক পথ। সেখানে বিনে পয়সায় চিকিৎসার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। কোন টাকা-পয়সার দরকারই হবে না। কাজেই আর সময় নষ্ট না করে বাড়িতে যেয়েই অসুস্থ বোনকে এখনই সেখানে নিয়ে যাও। তাছাড়া আমাদের তরফ থেকে টাকা-পয়সার কোন ব্যবস্থা এখন করা যাবে না। কারণ দেশের সামনে এখন বিরাট দায়িত্ব। ইলেকশন এসে গেছে। সব টাকা-কড়ি এখন ইলেকশন ফাণ্ডে জমা পড়ে গেছে।'

কি অমূল্য উপদেশ! যার ঘরে একমুঠো খাবার নেই, যে মুমূর্ষু বোনকে একটু সামান্য পথ্য দিতে পারছে না, গ্রাম্য কবিরাজকে দেখানোর খরচা যেখানে অপরে মিটিয়ে দেয়—সেখানে সেই অসহায় অন্ধ ছেলেটি তার মৃত্যুপথযাত্রী বোনটিকে কীভাবে তিনক্রোশ দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাবে সে ব্যাপারে তিনি কোন চিন্তাই করলেন না, বরং দেশের প্রতি দায়িত্বের কথা বলে কিছু উপদেশ শুনিয়ে দিলেন।

পদ্মপিসি সব শুনল। একটা কিছু করতেই হবে। মেয়েটা তো আর বিনে চিকিৎসায় মরতে পারে না। সে গোপালকে মনার কাছে রেখে নিজে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে নিজের ঘরে গেল। লক্ষ্মীর কৌটোয় প্রতিদিন সে দু-এক পয়সা করে রাখত। সেই পয়সা বের করে ছ' টাকা পঞ্চাশ পয়সা হল। কিন্তু এতে কুলোবে না, তাই প্রতিবেশী-দের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে আরও পাঁচ টাকার মতো যোগাড় করল।

এবার একটা আশার আলো সে যেন দেখতে পেল। এই টাকা দিয়ে যে করেই হোক মেয়েটাকে অন্তত একটা গরুর গাড়িতে করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যাবে। সে তাড়াতাড়ি গোপালের বাড়ির দিকে রওনা হল। কিন্তু সেই সংগৃহীত অর্থ নিয়ে সে যখন গোপালের বাড়ি এসে পৌঁছাল তখন সব শেষ।

গোপাল কিছুই বুঝতে পারেনি। সে তার বড় আদরের বোনটির প্রাণহীন দেহের পাশে বসে তখনও গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

অতি আদরের একমাত্র বোনকে হারিয়ে গোপাল এরপর পাগলের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ভিক্ষায়ও বেরয় না। যখন ঘরে থাকে তখন তার শতচ্ছিন্ন নোংরা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে মুখ বুজে পড়ে থাকে। আর মাঝে মাঝে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে। ঘরে খাবার নেই। পদ্মপিসি নিজে আধপেটা খেয়ে বাকিটা এনে গোপালকে খাইয়ে যায়। তার নিজেরই চলে না, তার ওপর আবার গোপালের ভার। সে-ও যেন আর এ-ভার বইতে পারছে না।

এই সময় পদ্মপিসির মায়ের পেটের এক বোন বেড়াতে এল তার বাড়ি। কলকাতার উপকণ্ঠে এক রিফিউজি কলোনীতে সে থাকে। তারও কেউ নেই। বিধবা। স্বামীর রেখে যাওয়া একখানা মাটির ঘর আর গোটা কয়েক নারকেল গাছ—আম গাছ নিয়ে তার বসত বাড়ি। মৃত স্বামীর প্রভিডেণ্ট ফ্যাণ্ডের সামান্য কিছু টাকা—এই তার সম্বল। পোস্ট-অফিসের মাসিক আয় প্রকল্পে রক্ষিত সেই টাকার সামান্য সুদ আর অন্যের বাড়ি কাজকর্ম করে যা পায় তা দিয়েই কোন রকমে তার দিন চলে যায়।

বোনকে পেয়ে পদ্মপিসির মাথায় একটা চিন্তা ঘোরপাক খেতে লাগল। বোনের ওখানে গোপালকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? কিছুদিনের জন্যে বোনের ওখানে থাকবে। এখন গোপালের যা মনের অবস্থা! নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে হয়তো তার মনের

পরিবর্তন হবে। তাছাড়া ওখানকার আশেপাশে বেশ কিছু বিত্তবান লোকের বাস। যদি গোপালের মনের কিছুটা পরিবর্তন হয় আর জায়গাটা ভাল লেগে যায় তাহলে লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে তার দিন ভালই কেটে যাবে। এখানে তাকে কে ভিক্ষে দেবে? অবশ্য গোপালকে সেখানে পাঠিয়ে তার মনটাও ভাল লাগবে না। পেটে না ধরলেও গোপালের প্রতি যে একটা অপত্যস্নেহ দিন দিন নিজের অলক্ষ্যেই তার মনে দানা বেঁধে উঠেছিল সেটা সে এখন বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারল। তবু ছেলেটার কথা চিন্তা করে সে বোনের কাছে তার ইচ্ছাটা প্রকাশ করল।

কিন্তু এই উট্‌কো ঝামেলা নিতে কে রাজী হয়? পদ্মপিপির বোনও হল না। কিন্তু বেশ কয়েকদিন থাকার পর সেই সহজ সরল শোকাতুর জন্মান্ধ ছেলেটির অসহায় অবস্থা দেখে তার নিজের সন্তানহীন জীবনে কেমন যেন এক পরিবর্তন সে অনুভব করল। তার অন্তরের নিভৃত গভীরে যে সুপ্ত মাতৃত্ব এদ্দিন জমাট বেঁধেছিল তা যেন হঠাৎ কোন মোহিনী মায়ার সংস্পর্শে এসে আস্তে আস্তে নব আবিষ্কৃত পথে অপরূপ স্নেহরসের ধারায় প্রবাহিত হল। তার মাতৃত্বের শূন্য মন্দিরে গোপাল যেন হঠাৎই তার স্থান করে নিল। পদ্মপিসির ইচ্ছা এখন যেন তার নিজেরই ইচ্ছা হয়ে দাঁড়াল।

নতুন স্থান ও নতুন পরিবেশে প্রথম প্রথম নিজেকে মানিয়ে নিতে গোপালের বেশ কিছুটা অসুবিধা হল। শিশুকালে সে মাকে হারিয়েছে। তারপর পদ্মপিসিই তাকে মায়ের স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে মায়ের অভাব কোনদিন উপলব্ধি করতে দেয়নি। সেই মাতৃসমা পদ্মপিসিকে ছেড়ে তার মনটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কালের অমোঘ নিয়মে বোনের মৃত্যু-বেদনাটা আস্তে আস্তে তার কাছে ঝাপসা হয়ে এলেও মাঝে মাঝে তার মনের মণিকোঠায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

এভাবে প্রায় সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। গোপাল আস্তে আস্তে

আবার কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। পদ্মপিসির বোনকে সে ছোটপিসি বলে ডাকে। তার নাম রাধা। রাধারও অবিদিত ছিল না গোপালের প্রতি কী গভীর স্নেহ ও ভালবাসাই না ছিল তার দিদির। সে-ও গোপালকে তার স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিতে চেষ্টার কোন কসুর করল না। কিন্তু ছোটপিসির আর্থিক অবস্থা এতদিনে গোপাল বুঝে নিয়েছে, এভাবে তার বোঝা হয়ে সে আর কতদিন কাটাবে ?

আসার সময় পদ্মপিসি গোপালের হাতে বিশটা টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিল—'কাছে রেখে দে, অসময়ে কাজে লাগতে পারে।' এই বিশটা টাকা জমাতে পদ্মপিসির কী কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে তা গোপাল জানে। তাই গোপাল প্রথমে কিছুতেই নিতে রাজী হয়নি। কিন্তু পিসির পীড়াপীড়িতে তাকে শেষ পর্যন্ত সে টাকাটা নিতে বাধ্য করেছিল। পদ্মপিসি তাকে কেন এখানে পাঠিয়েছে সেটা সে জানে। তাদের জায়গাটা পুরো পাড়াগাঁ। প্রায় সব লোকই সেখানে দিন আনে দিন খায়। সেখানে কে তাকে রোজ রোজ ভিক্ষে দেবে! এখানে কলোনীর পাশেই নবপল্লী। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বাস। প্রায় সব ঘরেই একটা নির্দিষ্ট মাসিক আয়ের ব্যবস্থা আছে—হয় চাকরি নয়তো ব্যবসা। তাই পদ্মপিসির ধারণা—গোপাল এখানে থাকলে ভিক্ষে করে সে ভাল-ভাবেই নিজের অন্নসংস্থানের একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। পদ্মপিসির এ ধারণাটা যে একেবারে অমূলক ছিল না সেটা কয়েক-দিন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাফেরা করেই বুঝতে পেরেছে।

পদ্মপিসির দেওয়া টাকাটা সে নিজের কাছেই রেখেছিল। আজ একবার সে টাকাটা বের করল। টাকাটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। সে তার এই অন্ধকারময় জীবনে একটা নতুন আলোক-বর্তিকা আবিষ্কার করল। সে ঠিক করল লোকের দয়া আর তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা নয়। সে স্বাবলম্বী হবে। পদ্মপিসির এই

কণ্টার্জিত টাকাটার সে যথোচিত মর্যাদা দেবে। চিন্তাটা মাথায় আসতেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

ছোটপিসি ঘরের দাওয়ায় বসে রেশনের চাল ঝাড়ছিল। গোপাল সেখানে চলে এল। পিসির পাশে মাটির দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল। পিসি ঝাড়া চাল একটা মাটির হাঁড়িতে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল—'কিরে গোপাল এখানে এভাবে বসে পড়লি কেন?'

গোপাল সে কথার জবাব না দিয়ে পিসির দিকে ফিরে বলল—'পিসি, তুমি আমাকে কিছু ধূপকাঠি কিনে দাও। তুমি তো বল—চক্রবর্তীর দোকান থেকে পাইকারী দরে মাল কিনে অনেকে পাড়ায় দোকান চালাচ্ছে। তুমিও আমাকে চক্রবর্তীর দোকান থেকে পাইকারী দরে ধূপকাঠি এনে দাও। আমি বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বিক্রি করব। ভিক্ষে করে অপরের দয়ার পাত্র হয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না।'

দুটো দশ টাকার নোট পিসির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে আবার বলল—'এই নাও। এ দিয়ে কালই আমাকে ধূপকাঠি এনে দেবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব। চক্রবর্তীদের সঙ্গে আমার একটু পরিচয় করিয়ে দিও। তারপরে আর তোমাকে যেতে হবে না। আমিই সব ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

এ প্রস্তাবের আকস্মিকতায় ছোটপিসি হাতের কাজ বন্ধ রেখে গোপালের দিকে তাকাল। তার চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ। সে একটু আপত্তি তুলে বলল—'তুই পাগল হয়েছিস গোপাল? তোর পক্ষে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করা কি সম্ভব? কে তোর কাছ থেকে তা কিনবে? আর কে-ই বা তোকে পয়সার হিসাব বুঝিয়ে দেবে?'

কিন্তু গোপাল তার প্রস্তাবে অনড়। ছোটপিসিকে সে তার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলল—'না পিসি, তুমি যা বলছ তা ঠিক নয়। আমার মতো একটা অন্ধ অসহায় বালককে সাহায্য করার

জন্যে তুমি দেখো—অনেকেই এগিয়ে আসবে। অনেকেই আমার কাছ থেকে ধূপকাঠি কিনবে। আর যারা কিনবে তারাই আমার পয়সা আমাকে ঠিক বুঝিয়ে দেবে। কেউ-ই আমাকে ঠকাবে না।'

ছোটপিসি আর কোন আপত্তি তুলল না। মানুষের প্রতি গোপাল এখনও বিশ্বাস হারায়নি এটা বুঝতে পেরে সে শুধু বলল—'আচ্ছা, দেখি। কাল চিন্তা করা যাবে। এখন টাকাটা তোর কাছেই থাক।' তারপর চালের হাঁড়িটা তুলে নিয়ে সে ঘরের ভেতর চলে গেল।

পরের দিন দুপুর কেটে গেল। তারপর বেলা গড়িয়ে বিকেল এল। রাধা গোপালকে নিয়ে কলোনীর পাশের বর্ধিষ্ণু এলাকার বিভিন্ন রাস্তাগুলো ঘুরল। উদ্দেশ্য গোপালকে সেই সব রাস্তা-গুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ফেরার পথে গোপাল ছোট-পিসি রাধাকে ধরল—'আজই আমাকে ধূপকাঠি কিনে দিতে হবে। কালই আমি সেগুলো নিয়ে বিক্রি করতে বেরব।' গোপালের পীড়াপীড়িতে ছোটপিসি চক্রবর্তীর দোকান থেকে গোপালের সেই টাকায় ধূপকাঠি কিনে নিয়ে এল।

পরের দিন সকালে উঠেই সে পিসিকে বলল—'পিসি, আমি আটটা নাগাদ এগুলো নিয়ে বেরব। বারোটার মধ্যেই ফিরে আসব। তুমি কোন চিন্তা কর না। কাল তোমার সঙ্গে ঘুরে রাস্তাঘাট আমার জানা হয়ে গেছে।'

পিসি তাকে অভুক্ত অবস্থায় ছাড়ল না। চা-মুড়ি খাইয়ে একটা সাইড ব্যাগে সব ধূপকাঠিগুলো ঢুকিয়ে এনে গোপালের হাতে দিল। গোপাল ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দাওয়া থেকে লাঠিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ভগবান মানুষকে যেমন অন্ধত্ব দিয়েছেন তেমনি তাকে আবার স্বাভাবিকের বেশি মাত্রায় স্পর্শেন্দ্রিয়ানুভূতিও প্রদান করেছেন। তাই গোপাল সেদিন যখন তার হাতের লাঠিটা ঠুকে ঠুকে ধূপ-কাঠির ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল আর 'ধূপকাঠি

চাই, ধূপকাঠি চাই বলে হাঁক দিল, তখন অনেকেই ভেবেছিল ছেলেটা খানা-খন্দে পড়ে হাত-পা না ভাঙে। কিন্তু খানা-খন্দে সে পড়েনি। বরং এই অন্ধত্ব ধূপকাঠি বিক্রি করার ব্যাপারে তার কাছে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। একটা অন্ধ ছেলেকে এভাবে স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকবার এই সাধু প্রয়াসকে অনেকেই উৎসাহ জানাল—তার কাছ থেকে ধূপকাঠি কিনে। দু-একটা রাস্তা ঘুরে বেলা দশটার মধ্যেই সে সমস্ত ধূপ-কাঠি বিক্রি করে ফেলল।

গোপালকে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ফিরতে দেখে রাধা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি যে সে এত শীঘ্র তার সমস্ত ধূপকাঠি বিক্রি করে ফেলেছে। সব শুনে সে-ও খুব উৎসাহ বোধ করল।

নবপল্লীর ঘাটে এখন দু-বেলাই গোপালকে দেখা যায়। নবপল্লী তার ভাল লেগে গেছে। ধূপের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে এ-রাস্তা থেকে ও রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সে বাড়ি-বাড়ি যায়। এখন আর সে ফেরিওয়ালার মতো রাস্তায় রাস্তায় হাঁক দিয়ে বেড়ায় না। এখন বাড়িগুলো তার চেনা। কোন বাড়িতে যেয়ে বলে—'বড়মা, আমি এসেছি', কোন বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে জানায় —'কাকাবাবু, আমি গোপাল এসেছি।' কারোর কলিংবেল টিপে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে—'আমি গোপাল।'

এমনি করে তার অমায়িক ও সহজ সুন্দর ব্যবহারের জন্য সকলেই তাকে ভালবেসে ফেলেছে। অনেকেই তাকে ঘরে ডেকে কিছু খেতে দেয়। ধূপকাঠি কেনে। গল্প করে। কোন কোন দিন গল্প করতে করতে দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যার ধূসর ম্লান ছায়া নবপল্লীর পথে-ঘাটে নেমে আসে। তখন গোপালকে রাস্তায় এনে তার বাড়ির পথ ধরিয়ে দেয়।

নবপল্লীতে ঢোকার বড় রাস্তাটার বাঁকে যেখানে আর একটা ছোট রাস্তা বাঁদিকে মোড় নিয়েছে তারই পাশে সেনবাবুদের বাড়ি। গোপাল সেই রাস্তা দিয়ে রোজই যাতায়াত করে। সেনবাবুর স্ত্রী

গোপালকে বড়ই স্নেহ করেন। প্রায় রোজই তিনি গোপালকে ডেকে নিয়ে ঘরে বসান। কোন কোনদিন নারকেল-মুড়ি, কোনদিন দুটো মোয়া, আবার মাঝে মাঝে গৃহদেবতার পূজার প্রসাদ গোপালকে খেতে দেন। সেনবাবুর ছ-সাত বছরের একটি নাতনী, মলি। প্রথম প্রথম গোপালকে দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। কাছে আসত না। কিন্তু দু-চারদিন যাওয়ার পর সে ঠাকুমার আঁচল ধরে কাছে এসে দাঁড়াত। তাদের কথাবার্তা শুনত। আস্তে আস্তে গোপালের প্রতি তার লাজুক ভাবটা কেটে গেল। সে-ও এখন গোপালের সঙ্গে বেশ গল্প করে—তার লাঠিটা কেড়ে নেয়—ধূপের ঝোলাটা নিয়ে টানাটানি করে। গোপাল রাগের ভান করে—আর সে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

একদিন গোপাল সেনবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মলি তখন জানলায় দাঁড়িয়ে। গোপালকে দেখেই মলি তাকে ডাকল—'গোপালদা, আমাদের বাড়িতে এস না।' মলির মুখে 'গোপালদা' ডাক শুনে গোপালের মনটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে ওঠে। বিস্মৃতপ্রায় বহুদিনের পুরনো মধুমাখা এই সম্ভাষণ তার দেহ-মনকে ক্ষণিকের জন্য রোমাঞ্চিত করে তোলে। সে যেন সাত বছরের এই ছোট্ট বালিকাটির মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট বোনটিকে খুঁজে পেল।

গোপালের যা আয় হয় তাতে তার সাধারণ জীবনযাত্রায় তেমন কোন আর্থিক অসুবিধা হয় না। রাধাপিসিই তার সবকিছু দেখাশোনা করে। সে গোপালের নামে স্থানীয় ডাকঘরে একটা পাশবই খুলে দিয়েছে। মাসের শেষে দু-পাঁচ টাকা জমাও দেয়। অসহায় ছেলেটার ভবিষ্যত চিন্তা করেই সে এ ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পদ্মপিসিকে একবার এখানে আসার জন্যে গোপাল তাকে চিঠি দিয়েছে। সে যে আর ভিক্ষাজীবী নয়—এখন সে স্বাবলম্বী, এটা পদ্মপিসিকে সে দেখাবে। দেখে পদ্মপিসি খুশী হবে। তাতেই গোপালের পরম তৃপ্তি।

মলিকে সে এখন মনা বলে ডাকে। এই মনা ডাকের ভেতর দিয়ে সে যেন তার স্মৃতির অন্ধকার জগত থেকে তার আদরের মনাকে আবার আলোর আঙিনায় ফিরিয়ে এনেছে। এখন এই মনাকে একদিন না দেখলে সে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। কাজের শেষে গোপাল এখন প্রায়ই সেনবাবুর বাড়ি যায়। যাওয়ার সময় পাড়ার দোকান থেকে মলির জন্যে একটা দুটো টফি, কোন কোনদিন বাদাম বা বিস্কুট কিনে নিয়ে যায়। যে বোনটা বিনে চিকিৎসায় তার সামনে অভুক্ত অবস্থায় তিল তিল করে মরেছে তাকে সে আর কোনদিনই ফিরে পাবে না। ওর অতৃপ্ত আত্মা আজও যেন তার চারপাশে হাহাকার করে ঘুরে বেড়ায়। মলিকে এই সামান্য উপহারটুকু দিয়ে সে যেন তার বেদনাবিদুর মনে একটু তৃপ্তির আনন্দ খুঁজে পায়।

দেখতে দেখতে এরই মধ্যে প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। চৈত্রের এক ভরাদুপুরে গোপাল তার এই নতুন আশ্রয়ে এসে প্রথম উঠেছিল। তারপর তিন তিনটে ঋতু সে এখানে পার করে দিয়েছে। শরতের আকাশে বাতাসে এখন আগমনী সুরের পরশ। সামনে শারদীয়া দেবীপুজো, তারপরেই মলির জন্মদিন। মলি আগেই গোপালকে তার জন্মদিনের কথা জানিয়ে রেখেছে।

এর মাঝে পদ্মপিসি ছোটবোনের বাড়ি এসেছিল। গোপালের এখানে একটা হিল্লে হয়ে গেছে দেখে সে খুব খুশি। গোপাল দুই পিসিকে দোকানে নিয়ে গিয়ে তাদের দুজনকে দুটো পুজোর শাড়ি কিনে দিয়েছে। প্রথমে আপত্তি জানালেও পাছে গোপাল দুঃখ পায় এই ভেবে তারা আর আপত্তি জানায়নি। এই তো সেদিনও গোপাল ছিল সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল। দু-বেলা দুটো আহারের জন্য তাকে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়েছে। পদ্মপিসি নিজে আধপেটা খেয়ে গোপালকে বাকিটা খাইয়েছে। নিজের বোনটাকে মৃত্যুকালে সামান্য একটু পথ্য পর্যন্ত দিতে পারেনি। সেই গোপাল আজ তাকে শাড়ি কিনে দিচ্ছে এর চেয়ে পদ্মপিসির

আনন্দের আর কী থাকতে পারে! যাওয়ার আগে গোপালকে সে কয়েকদিনের জন্যে তার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। গোপালেরও মন খুব চাইছিল। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই মনার জন্মদিন। সেনবাবুরা গোপালকে আগেই বলে রেখেছেন। মলির জন্মদিনে তার কাজে বেরনো চলবে না। সারাদিন তাকে তাঁদের বাড়ি থাকতে হবে। তাই গোপাল অনেক ভেবে-চিন্তে পিসিকে বলল—'না পিসি, তোমাকে তো বলেছি, কয়েকদিন বাদেই মনার জন্মদিন। আমাকে আগেই তাঁরা নেমন্তন্ন করে রেখেছেন। তাই এখন চলে যাওয়া কি ঠিক হবে? তার চেয়ে তুমি বরং কালীপুজোর পরে এস। তখন আমি নিশ্চয়ই যাব।'

অপরে না জানলেও পদ্মপিসির কাছে এটা অজ্ঞাত ছিল না যে অত বলা সত্ত্বেও গোপাল কেন তার নিজের গ্রামে এখন যেতে চাইছে না। সে যেদিন শুনেছে মলিকে গোপাল মনা বলে ডাকে সেদিনই সে বুঝতে পেরেছে গোপালের জীবনে সর্বপ্রথম স্নেহের পরশ যে লাগিয়েছিল, যাকে নিয়ে সে নিদারুণ নিরানন্দের মধ্যেও পরম আনন্দের স্বপ্ন দেখত, তার সেই নিজের ছোট্ট আদরের বোনটিকে হারিয়ে সে আজ এই মলির মধ্যেই সেই মৃত মনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে। সেই মলির জন্মদিনকে উপেক্ষা করে তার পক্ষে এখন যাওয়া যে সম্ভব হবে না পদ্মপিসি আগেই সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। তাই গোপালকে আর পীড়াপীড়ি না করে সে পরে আবার আসবে একথা জানিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেল।

সেদিন ১৭ই আশ্বিন, মলির জন্মদিন। সকাল থেকেই গোপাল মলিদের বাড়িতে। কাছাকাছি আত্মীয়-স্বজনদের প্রায় সবাই এসেছে। পাড়ার বেশ কয়েকজন মহিলাও নিমন্ত্রিত। তাঁরা সকলেই মলির বান্ধবীদের মা। মেয়েদের সঙ্গে তাঁরাও নিমন্ত্রিত।

অজিত রায় নাম-করা পলিটিকাল লীডার। এখানকার অঞ্চল প্রধান। সেনবাবুদের পাড়ায় থাকেন। উপকারের চেয়ে অপকারের

ভয়ে রাজনৈতিক দাদাদের আজকাল সকলেই তোয়াজ করে। আন্তরিক না হলেও একটা মৌখিক সম্প্রীতি বজায় রেখে সর্বদা চলার চেষ্টা করে। তাই পাড়ার সকলে নিমন্ত্রিত না হলেও অজিত রায় কিন্তু সপরিবারে সব অনুষ্ঠানে সকলের বাড়ি নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। ব্যস্ত মানুষ। নিজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এখন হোল টাইম দেশসেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এবং ইদানীং পৈত্রিক মাটির বাড়িটা ভেঙে দোতলা করেছেন। তিনি কখন ফিরবেন তা বলা মুশকিল। তাই পুত্র সমুকে নিয়ে রায়গিন্নি সকাল সকালই সেনবাবুর বাড়ি এসে গেছেন।

মলি খুব সেজেছে। মায়ের নতুন সিল্কের শাড়িটা পিসিমণি কেমন সুন্দর করে জড়িয়ে ছোট করে পরিয়ে দিয়েছে। হাতে ছোট বালা। গলায় দিদিমার দেওয়া সাতনরি হার। গাল ও কপাল সাদা চন্দনে চর্চিত।

গোপাল পেছনের বারান্দায় বসে মাটির গ্লাসগুলো জলে ধুয়ে সাজিয়ে রাখছিল। মলি তার দলবল নিয়ে সেখানে হাজির—'চল গোপালদা, আমরা 'ও গোলাপ—ও টগর' খেলি। এগুলো হরিদা ধুয়ে রাখবেখন।' বলেই সে গোপালের হাত ধরে টানতে টানতে সামনের বারান্দায় নিয়ে এল। সে তার বন্ধুদের নাম একে একে গোপালের কাছে বলল। তারপর গোপালকে বলল—'শোন গোপালদা, আমি 'ও গোলাপ' বা 'ও টগর' বলে ওদের ডাকব। ওরা এক একজন এসে তোমার কপালে টোকা মারবে। তোমাকে কে টোকা মারল তার নাম বলে দিতে হবে।'

গোপাল অন্ধ। তবু মলি দু-হাতের আঙুল দিয়ে তার চোখ দুটো টিপে ধরল। তারপর ডাকতে শুরু করল—'আয়রে আমার গোলাপ।'

অমনি তার এক বন্ধু এসে গোপালের কপালে আস্তে টোকা মারল। কে টোকা মারল গোপালকে তার নাম বলতে হবে। সে ভুল নাম বলে।

আবার তার চোখ টিপে ধরে মলি ডাকে—'আয়রে আমার টগর।'

টগর এসে গোপালের কপালে টোকা মারে। তাকে নাম জিজ্ঞেস করে। এবারও সে সঠিক নাম বলতে পারে না।

এভাবে খেলা চলতে থাকে। এক সময় গোপাল সঠিক নাম বলে দেয়। অমনি 'গোপালদা পেরেছে! গোপালদা পেরেছে!' বলে সকলে হৈ-হৈ করে ওঠে। যার নাম গোপাল সঠিক বলতে পেরেছে তাকে এনে গোপালের জায়গায় বসানো হল। আবার খেলা চলল। হঠাৎ ভেতর থেকে ডাক পড়ল—'বাচ্চারা সব খেতে এস। মলি, তুমিও ওদের সঙ্গে চলে এস।' ডাক শুনে সকলেই ভেতরে চলে গেল।

মলি গোপালের কাছে এসে বলল—'গোপালদা, তুমি খাবে না?' গোপাল মলির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—'মনা, তুমি খেয়ে নাও। আমি পরে বড়দের সঙ্গে খাব।' বলেই সে উঠে দাঁড়াল। মলিকে নিয়ে সে দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো তার ঝোলাটার কাছে গেল। মনার আজ জন্মদিন। নিজের হারিয়ে যাওয়া ছোট বোনটার জন্মদিনের কথা সে কোনদিন চিন্তাও করতে পারেনি। কবে যে তার জন্মদিন তাও সে জানত না। মলির জন্মদিনে অনেকেই তাকে নানা ধরনের দামী দামী উপহার দেবে। গোপালও তার মনার জন্যে একটা ভাল স্প্রিংয়ের খেলনা কিনে এনেছে। অন্যদের নামী-দামী উপহারের পাশে তার এই সামান্য খেলনাটা হয়তো মানানসই হবে না একথা ভেবেই সে এতক্ষণ খেলনাটা তার ঝোলার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। মনা এবার খেতে যাবে। খেলনাটা তাকে এখন দেওয়া দরকার। তাই ঝোলা থেকে সেটা বের করে মলির হাতে দিয়ে বলল—'দেখতো মনা, খেলনাটা কেমন হবে? এটা তোমার জন্যে।'

খেলনাটা হাতে পেয়ে মলি আনন্দে চিৎকার করে উঠল—'কী সুন্দর! কী সুন্দর! তোমরা সবাই দেখো, গোপালদা আমাকে

কী সুন্দর খেলনা দিয়েছে। আমি সবাইকে দেখিয়ে আনি।' বলেই সে লাফাতে লাফাতে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

মলি বারন্দা থেকে বেরিয়ে যেতেই সমু এসে সেখানে একটা চেয়ারে বসল। গোপাল তখনও দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে।

সমু গোপালকে জিজ্ঞেস করল—'কিরে গোপাল তোর বেচা-কেনা কেমন চলছে? ব্যাটা, নিজে খেতে পাস না, ভিখারির মতো দয়া করে তোকে দুটো খেতে দেবে—তা আবার একটা খেলনা নিয়ে আসা হয়েছে! ওটা কি কিনেছিস্, না দোকান থেকে হাত-সাফাই করেছিস?'

সমুর কথায় গোপালের মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। সে গরিব হতে পারে কিন্তু চুরি করে কোন জিনিস সে সংগ্রহ করবে এ ভাবাও যায় না। সে সমুর কথার কোন জবাব না দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে—'কি সর্বনাশ! কোথায় গেল? কে নিল? খোঁজ, খোঁজ' ইত্যাদি নানা প্রকার মেয়েলি গলার চিৎকার শোনা গেল। সেনবাবুর স্ত্রী, ছেলের বৌ, এবং আমন্ত্রিতদের অনেকেই এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।

'কোথায় গেল? এই তো খানিক আগেও ওর গলায় ছিল! এর মধ্যে কোথায় গেল?' বলতে বলতে সেনবাবু বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। অজিত রায়ের ছেলে সমু আর গোপাল সেখানে দাঁড়িয়ে।

সেনবাবু গোপালকে বললেন—'জান গোপাল? মলির গলার হারটা পাওয়া যাচ্ছে না!'

গোপাল সে কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারপর সেনবাবুকে বলল—'ও এখানেই ছোটাছুটি করছিল। নিশ্চয়ই এখানেই পড়েছে। আপনি ভাল করে দেখুন। মনা চলা যেতেই সমু দাদাবাবু এলেন। দেখুন তো ওনার চোখে পড়েছে কিনা!' সেনবাবু বারকয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর সমুকে জিজ্ঞেস করলেন—'সমু, এখানে হারটা পড়েনি তো? এখানে বসেই ওরা

সব খেলছিল।'

সমু একবার বারান্দার এপাশ ওপাশ দেখে বলল—'না তো? এখানে তো দেখছি না? আমি তো এইমাত্র এখানে এলাম!' কথাটা বলেই সে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

মলির গলার সাতনরি হারটা পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিকে খোঁজার পরও পাওয়া যাচ্ছে না। আনন্দের হাটে হঠাৎ নিরানন্দের ছায়া পড়ল। ঠিক হল—খাওয়া-দাওয়া শেষ হোক। তারপর নাকাশীপাড়ার গোবিন্দ ওঝাকে দিয়ে বাটি চালান দেওয়া হবে। গোবিন্দ ওঝার বাটি চালান অব্যর্থ। মন্ত্রপূত চলমান বাটি ঠিক যেয়ে চোরের গায়ে বেয়ে উঠবে।

বাড়ির লোকজন ছাড়া আর সকলেরই খাওয়া শেষ। গোপাল এখনও খায়নি। সে সেনবাবুদের সঙ্গে খাবে। যাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে তারা এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে লাগল—যদি কোথাও পড়ে গিয়ে থাকে।

সমু এসে হঠাৎ মলির মাকে বলল—'কাকিমা, চলুন তো দেখি। সামনের বারান্দাটা ভাল করে খুঁজে দেখি। ওখানে বসেই তো ওরা খেলছিল।'

বারান্দায় তখন কেউ নেই। সমু মলির মাকে নিয়ে বারান্দায় চলে এল। রায়গিন্নিও ওদের পেছন পেছন এলেন। সমু মলির মার কানে-কানে কী যেন বলল। মলির মা ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বললেন—'না সমু, ও তা করবে বলে মনে হয় না।'

সমু তাঁকে আবার বলে—'জানেন কাকিমা, মলি ঘরে চলে যাওয়ার পর আমি ওকে ঐ ব্যাগটা নাড়াচাড়া করতে দেখেছি।' বলেই সে আঙুল দিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো ব্যাগটা মলির মাকে দেখাল। তারপর বারান্দার এদিক-ওদিক আনাচে-কানাচে দু-একবার খুঁজে এসে মলির মাকে বলল—'আমি বলি কি কাকিমা, আপনি গোপালের ব্যাগটা একবার সার্চ করে দেখুন। কিছুই বলা যায় না। আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

রায়গিন্নি মলির মার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখে সুগন্ধি জর্দা-পান, বারান্দার একপাশে যেয়ে পানের পিকটা ফেলে বললেন। —'সমু হয়েছে ঠিক ওর বাবার মতো! কারোর অসময়ে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এই তো দেখ, এত লোক রয়েছে। অথচ মলির হারটা নিয়ে ওরই যত মাথাব্যথা! আর তোকেও বলি সমু, তোর কী দরকার? কাকিমা যখন গোপালকে সন্দেহ করছেন না তখন মিছে কেন তাঁকে এসব কথা বলে গোল পাকাচ্ছিস?' তারপর তিনি একটু ভারিক্কি চালে বললেন—'চল্, তোর বাবার আসার সময় হয়েছে।'

সমুর মার এ ধরনের মন্তব্যের পর গোপালের ব্যাগটা সার্চ না করা ভাল দেখায় না। তাই মলির মা বললেন—'না দিদি, সমু ঠিকই বলেছে। আজকাল কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।' বলেই তিনি দেওয়ালের কাছে যেয়ে হুকে ঝোলানো গোপালের ব্যাগটা নামিয়ে আনলেন। ভেতরে কয়েক প্যাকেট ধূপ। হাত দিয়ে ধূপের প্যাকেট কটা সরাতেই মলির মার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল—'এই তো মলির হার!'

সন্দেহভাজন ব্যক্তি না হয়ে আস্থাভাজন লোক যখন দোষী সাব্যস্ত হয় তখন মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সাধারণ বুদ্ধিও তখন লোপ পায়। বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে ক্ষোভের আগুনে সে তখন দগ্ধ হতে থাকে, মানসিক উত্তেজনায় মরিয়া হয়ে ওঠে। মলির মার অবস্থাও হল তাই। তিনি হঠাৎ চিৎকার করে গোপালের উদ্দেশ্যে বললেন—'কোথায় গোপাল? কোথায় সে হারামজাদা! ওকে মেরে এখনই বাড়ি থেকে দূর করে দাও।'

মলির মার চিৎকারে গোপাল দেওয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে বারান্দায় নেমে এল। অন্যান্য সকলেও বারান্দায় জড় হয়েছে। গোপাল কিছুই জানে না। সে সহজ-সরলভাবে মলির মাকে জিজ্ঞেস করল—'মনার হার কোথায় পেলেন, মা?'

মলির মার চোখ-মুখ দিয়ে তখন ভেতরের ক্রোধ ঠিকরে

বেরচ্ছে। তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না—'কোথায় পেলেন মা? ন্যাকামি হচ্ছে?' বলেই তিনি ঠাস্ করে গোপালের গালে সপাটে এক চড় বসিয়ে দিলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় গোপাল বিমূঢ়। চারদিকে একটা থমথমে ভাব। একটা চাপা ফিস্‌ফিসানি। কেমন যেন একটা অঘটনের পূর্বাভাস।

রায়গিন্নি ছেলের কৃতিত্বে গর্বিতা। তবু কেন যেন একটা সংশয় তাঁর মনের ভেতর খোঁচা দিচ্ছে।

গোপাল হাউহাউ করে কেঁদে মলির মার পা জড়িয়ে ধরে বলল—'আপনি বিশ্বাস করুন মা, আমি মনার হার চুরি করিনি! আমি ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি! আপনি বলুন—কোথায় মনার হার পাওয়া গেল?' বলেই সে তার অশ্রুসজল অন্ধ চোখে মাথা তুলে মলির মার মুখের দিকে কাতরভাবে তাকাল।

পাশেই মলির কাকা দাঁড়িয়েছিল। গোপালেরই বয়সী। সে চিৎকার করে বলল—'চোর, বাটপাড়! তুমি জান না কোথায় হার পাওয়া গেল? নিজের থলিতে ধূপকাঠির নিচে হারটা লুকিয়ে রেখে এখন ন্যাকা সাজছ—কোথায় পাওয়া গেল?' বলেই সে গোপালের ঘাড় ধরে কয়েক ঘা লাগাল। তারপর ধাক্কা মেরে দরজার দিকে ঠেলে দিল। অন্ধ গোপাল নিজেকে সামলাতে পারল না। দরজা দিয়ে নিচে পড়ে গেল। ঠোঁট কেটে চিবুক দিয়ে রক্তের ধারা বইল। তবু সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—'কাকাবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি হার চুরি করিনি!'

সেনবাবুও সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গোপালকে সন্দেহ করার কারণ থাকলেও তিনি কিন্তু সমুর হার খুঁজে বের করার এতটা আগ্রহকে খুব ভাল চোখে দেখেননি। সমুকে তিনি জানেন। বাবার রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে ছেলেটা একটা আস্ত বাঁদর হয়ে উঠেছে। ক্লাস এইটে বার দুয়েক ফেল করে বাপের সুপারিশ-তদ্বিরের জোরে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এখন শোনা

যাচ্ছে নেশা-ভাঙও নাকি ধরেছে। হাত-টানের দু-একটা সংবাদও শোনা যাচ্ছে। অথচ অজিত রায়ের ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না।

সেনবাবু গোপালের এই অবস্থা দেখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিবেকের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে হার মেনে শুধু ছেলেকে ভর্ৎসনা করে বললেন—'ছি, ছি, তোরা এসব কী করছিস? হারটা যখন পাওয়াই গেছে তখন আজকে এই আনন্দের দিনে ছেলেটাকে মারধর করে কী একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করছিস?'

এই সময় অজিত রায় পার্টির মিটিং সেরে সোজা বাইকে করে সেনবাবুর গেটের সামনে এসে নামলেন। সব শুনে তিনি ভারিক্কি গলায় নেতাসুলভ ভঙ্গিতে বললেন—'এই স্কাউন্ড্রেলটাকে আপনারা যখন বাড়িতে ডেকে অতটা প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তখনই জানতাম এরকম একটা কিছু ঘটা অসম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। পাড়ার ভাল-মন্দ আমাকেই দেখতে হয়। কাজেই আর বিলম্ব নয়। এরকম ঘটনার আর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্যে অনতিবিলম্বে ওর মাথা মুড়ে ঘোল ঢেলে এ অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার।'

পাড়ার লীডারকে এভাবে বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা শোভন নয়। তাই অজিত রায়কে সেনবাবুর ছেলেরা সাদর অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। যারা সেখানে এসে ভিড় করেছিল তার মধ্যে অজিত রায়ের খুব কাছের কয়েকজন তাঁর পেছন পেছন ঘরে ঢুকল। বাকি সকলে সেখান থেকেই নিজেদের বাড়িতে চলে গেল। আর হতভাগ্য গোপাল অভুক্ত অবস্থায় চুরির দায় মাথায় নিয়ে টিপে-টিপে পা ফেলে সেই শরতের পড়ন্ত দুপুরে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেনবাবু আর তাঁর স্ত্রী গোপালকে এভাবে মেরে তাড়িয়ে দেওয়াটা যেন মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারলেন না। কোথায় যেন একটা ভুল থেকে যাচ্ছে।

সেনবাবু স্ত্রীকে বললেন—'জিনিসটা যখন পাওয়াই গেল তখন অনর্থক ছেলেটাকে ওভাবে মারধর করে অভুক্ত অবস্থায় তাড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক হল? এতে মলির অকল্যাণ হবে। গোপালকে এ্যাদ্দিন দেখলাম। শেষ বয়সে মানুষ চিনতে ভুল করব? তুমি ঠিক জেন, ও হার গোপাল চুরি করেনি। সমুই বারান্দায় ওটা পেয়ে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর বাটি চালানোর ভয়ে গোপালের থলিতে রেখে পরে কায়দা করে সেটা বের করে গোপালের মাথায় চুরির অপবাদটা সুনিপুণভাবে চাপিয়ে দিয়েছে। কী আর করব! জলে বাস করে তো আর কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না? আর তাছাড়া, সরাসরি যখন ওকে ধরাও যায়নি।'

সেনবাবুর স্ত্রী স্বামীর কথার জের টেনে বললেন—'সে যাই হোক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তুমি এক কাজ কর। তুমি তো ওর পিসির বাড়ি চেন। তুমি যেয়ে ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিয়ে এস। ছেলেটা না খেয়ে চলে গেল। আমার একদম ভাল লাগছে না।'

সেনবাবু তাই ঠিক করলেন। তিনি ঘরের অন্যান্যদের কাছেও তার মনোভাব ব্যক্ত করলেন। সমুকে তারাও জানে, ঠাণ্ডা মাথায় সেনবাবুর কথাটা তারাও বুঝতে পারল।

সেনবাবু গোপালকে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তাঁকে আর বেরতে হল না। তার আগেই জানা গেল গোপাল রেল লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

যদি ইহলোকের পর পরলোক বলে সত্যি সত্যিই কোন কিছুর অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে চিত্রগুপ্তের খাতায় সমুর নামে যে কলঙ্কিত নতুন অধ্যায়টি যুক্ত হল তা দেখে গোপালের ইহলোকের অতৃপ্ত আত্মা নিশ্চয়ই পরলোকে তৃপ্তিলাভ করবে।

* * *

বিবেকের বলি

পীচ ঢালা পাকা রাস্তা ধরে বাসটা ছুটে চলেছে দুরন্ত গতিতে। রেল স্টেশন থেকে রাস্তা চলে গিয়েছে পলাশপুর ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে। আকাশে তখন পড়ন্ত সূর্যের সোনালী আলো। সে আলোতে চল্লিশোর্ধ সুন্দরী রমণীর মধুর হাসির মতো মাদকতা থাকলেও তীব্রতা নেই।

রাস্তার দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠে মাঠে ফসল। বাসটায় বেশ ভিড়। বাসের জানলার পাশে একটা সিটে অন্য-মনস্ক হয়ে বসে আছে দিবাকর। শেষ বিকেলের রঙিন আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে এসে রাঙিয়েদিচ্ছে দিবাকরের মুখটাকে।

ডাক্তারি পড়ার সময় থেকেই দিবাকরের ইচ্ছা ছিল আর পাঁচজন ডাক্তারের মতো চেম্বার সাজিয়ে রুটিনমাফিক দুবেলা রুগী দেখে সে দু'হাতে টাকা রোজগার করবে না। তার এই বাসনার অন্য একটা কারণও ছিল। তার মা মারা যাওয়ার পূর্বে—তখন সে ফোর্থ-ইয়ারের এম: বি. বি.এস. ছাত্র—তাকে তাঁর মৃত্যুশয্যায় ডেকে বলেছিলেন—'দিবা, আমি চলে যাচ্ছি বাবা। কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম তা দেখে যেতে পারলাম না। তুই ডাক্তারি পাশ করবি। ডাক্তার হবি। কিন্তু টাকার লোভে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবি না। ডাক্তারের কাজ সেবার কাজ। লোকের জীবন-মরণ তাঁর হাতে। এ কাজে দায়িত্বও অনেক। সে দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে অনেক বাধাও আসতে পারে। কিন্তু তা হলেও সে বাধার কাছে কখনও নতিস্বীকার করবি না।

আজ পলাশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চাকরি নিয়ে যাওয়ার পথে বাসে বসে মায়ের সেই কথাগুলো মনে পরে দিবাকরের।

কোন দিন কোন অবস্থায়ই মায়ের সেই শেষ ইচ্ছার অবমাননা সে হতে দেবে না।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে অর্থের প্রয়োজন তো আছেই। কিন্তু সে-অর্থ সে হাত পেতে এসব গরিব-দুস্থ অসহায় রুগীর কাছ থেকে কোনদিন নিতে পারবে না। তাই এম. বি. বি.-এস. পাশ করার পর সে ঠিক করল কোন হাসপাতালে চাকরি নিয়ে নিজের সাধ্যমত রুগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

হেলথ সার্ভিস-এ পরীক্ষা দিয়ে সে সরকারি চাকরি পেয়ে গেল। আর তার প্রথম পোস্টিং পেল পলাশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে।

দিবাকর যখন বাস থেকে পলাশপুর নামল তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। সূর্যদেব পাটে নেমেছেন। এখনই অন্ধকারের কালো ছায়া পলাশপুরের পথে-ঘাটে নেমে আসবে।

দিবাকরের সঙ্গে হোল্ডলে জড়ানো বিছানা আর হাতে একটা সুটকেস।

বাস থেকে নামতেই এক রিকশাওয়ালা এগিয়ে এসে বলল—'কোথায় যাইবেন, বাবু?'

দিবাকর হাতের বিছানা আর সুটকেসটা পাশের একটা খালি বেঞ্চিতে রেখে বলল—'হাসপাতালে যাব। তুমি হাসপাতাল চেন তো?'

রিকশাওয়ালা একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল—'কি যে কন বাবু! হাসপাতাল চিনুম না? আমার চক্ষুর সামনে হাসপাতাল হইল—আর আমি তাই চিনুম না?' বলতে বলতে সে দিবাকরের জিনিসপত্র রিকশায় তুলে নিয়ে আবার চলল—'চলেন, আপনারে হাসপাতালে পেঁছাইয়া দিয়া আসি!'

রিকশায় যেতে যেতে দিবাকর দেখল পলাশপুর গ্রাম হলেও একেবারে গণ্ডগ্রাম নয়। একটা ডাকঘর, গোটাকয়েক রাইসমিল, এছাড়া একটি গ্রামীণ ব্যাংকও রয়েছে—হাসপাতাল তো রয়েছেই। কাজেই পলাশপুর সেদিক দিয়ে পশ্চিম বাংলার গ্রামের মধ্যে

কৌলিন্য দাবি করতে পারে।

বাসস্টপেজ থেকে একটা পাকা রাস্তা সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। রিকশায় চেপে দিবাকর রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল—'হাসপাতাল কতদূর হবে গো?'

রিকশাওয়ালা প্যাডেলে চাপ দিয়ে রিকশায় চেপে বসে বলল—'এই কাছেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলল—'আপনি বুঝি নতুন ডাক্তারবাবু হইয়া আইলেন।'

দিবাকর হেসে জবাব দিল—'ঠিক ধরেছ তো! হ্যাঁ, আমিই তোমাদের নতুন ডাক্তারবাবু হয়ে এলাম।'

রিকশাওয়ালা আর কোন কথা বলল না। তাকে চুপচাপ দেখে এবার দিবাকরই জিজ্ঞেস করল—'কিগো, আর কিছু বলছ না যে?'

রিকশাওয়ালা এবার নিরাশ কণ্ঠে বলল—'কি আর কমু বাবু! এই ক'বছরে কত ডাক্তারবাবু আইলেন আর গ্যালেন। দুই-এক বছরও টেঁকলেন না কেউ।'

কথাটা দিবাকরকে একটু ভাবিয়ে তোলে। সে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চায়—কেন, টিঁকল না কেন?'

'কী করে কই বাবু! হয়তো আমাদের এ জায়গাটা তেনাদের ভাল লাগত না। আমরা গরিব মানুষ বাবু। হাসপাতাল থেইক্যা ওষুধ-পত্তর না পাইলেও—ওনারা লেইখ্যা দিতেন—দোকান থেইক্যা কেনতাম। তবু তো ডাক্তারের খরচ লাগত না। তা একজন চইল্যা গেলে আর একজনার আইতে বছর ঘুইর‍্যা যায়।'

দিবাকর আবার প্রশ্ন করে—'হাসপাতাল থেকে ওষুধ-পত্তর পেতে না কেন?'

রিকশাওয়ালা বলল—'কী জানি, বাবু। দ্যাখতাম ওষুধ-পত্তর তো মাঝে-সাঝে আইত। ডাক্তারবাবুও লেইখ্যা দিতেন। কিন্তু ওষুধ নিতে গ্যালেই বড়বাবু কইতেন—হাসপাতালে ওষুধ নাই।

বাইরের দোকান থেইক্যা কিন্না নিস।'

দিবাকর কী যেন বলতে যাচ্ছিল। এর মধ্যে রিকশাওয়ালা একটা প্রাচীরঘেরা কম্পাউন্ডের গেট দিয়ে তাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একটু এগিয়ে রিকশাওয়ালা তাকে জিজ্ঞেস করল—'আপনারে আফিস ঘরের সামনে লইয়া যাই, বাবু?'

দিবাকর বুঝতে পারল এটাই হাসপাতাল। কম্পাউন্ডটা বেশ বড়। গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে হাসপাতালের বিল্ডিং। সে রিকশাওয়ালাকে বলল—'তাই নিয়ে চল।'

বিছানা আর সুটকেসটা অফিস-ঘরের বারান্দার এক কোণে নামিয়ে রেখে রিকশাওয়ালা ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হাসপাতাল কম্পাউন্ডের বিজলীবাতিগুলো এখানে-সেখানে জ্বলে উঠেছে।

দিবাকর বারান্দায় উঠে দেখল অফিস-ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে ভেজান। ভেতরে আলো জ্বলছে। সে বুঝল ভেতরে লোক আছে। দরজার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে সাড়া এল—'কে?'

দিবাকর বাইরে থেকেই জবাব দিল—'আমি ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিস থেকে আসছি।'

দিবাকরের জবাব শুনে ভেতর থেকে কে একজন বলল—'কি মুশকিল! কি মুশকিল! আপনি জেলা অফিস থেকে আসছেন—আর বাইরে দাঁড়িয়ে!'

দিবাকর বুঝতে পারল লোকটি কথা বলতে বলতে কিছু খাতা-পত্র আর কাগজ-পত্র কোথাও সরিয়ে রাখছে।

দিবাকর কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর লোকটি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। দিবাকর দেখল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চোখে চশমা। মাথার মাঝখানে প্রকাণ্ড টাক। গায়ে ফতুয়া টাইপের একটা জামা। দিবাকরকে দেখেই ভদ্রলোক বিগলিত হললেন—'এ অসময়ে কেন, স্যার?' তারপর চশমার

ফাঁক দিয়ে দিবাকরকে ভাল করে দেখে বললেন—'আপনাকে তো এর আগে জেলা অফিসে দেখিনি। নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন মনে হয়।'

দিবাকর ভদ্রলোকের ভুল বুঝতে পেরে বলল—'আমি ডিস্ট্রিক্ট অফিস থেকে পোস্টিং অর্ডার নিয়ে এখানে ডাক্তার হিসেবে কাজে যোগদান করার জন্যে এসেছি।'

ভদ্রলোক দিবাকরের কথা শুনে আরও গদ্‌গদ হয়ে বললেন—'তাই বলুন, স্যার! আমি তো ভাবলাম এই অসময়ে আবার কে এলেন?' বলেই তিনি চিৎকার করে ডাকলেন—'ওরে জগা, এদিকে আয়। আমাদের নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন।' তারপর তিনি দিবাকরকে জিজ্ঞেস করলেন—'জিনিসপত্র কোথায় রেখেছেন, স্যার?'

দিবাকর বলল—'আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি জিনিসপত্র তেমন কিছুই আনিনি। একটা বেডিং আর একটা সুটকেস। তা ওপাশে রয়েছে।'

ভদ্রলোক এবার বললেন—'এই দেখুন! আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সমানে কথাই বলে যাচ্ছি। আসুন-আসুন, ভেতরে এসে বসুন।' বলেই তিনি দিবাকরকে অফিস-ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন।

জগা ইতিমধ্যে এসে গেছে। সে দিবাকরকে একটা সেলাম দিয়ে ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি জগাকে দিবাকরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—'এ আমাদের জগা। একে দারোয়ানও বলতে পারেন, আবার অফিস-পিওনও বলতে পারেন।'

তারপর তিনি জগাকে বললেন—'যা তো, স্যারের বেডিং আর সুটকেসটা বারান্দায় আছে, আপাতত আমার ঘরে রেখে আয়।'

জগা বারান্দায় বেরিয়ে গেলে ভদ্রলোক দিবাকরকে একটা চেয়ারে বসতে বলে নিজে আর একটা চেয়ার টেনে দিবাকরের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে বসলেন। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে দিয়ে বললেন—'আমার নাম গোবিন্দ তরফদার। আমিই এখানকার হেড ক্লার্ক-কাম-স্টোরকিপার।'

গোবিন্দবাবু নিজের পরিচয় দিলে দিবাকর তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার-কাম-পোস্টিং অর্ডারটা গোবিন্দবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'আমার এখানে থাকার কী ব্যবস্থা আছে গোবিন্দবাবু ?'

'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না স্যার। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। কি মুশকিল!' বলেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—'চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক। হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করবেন।'

গোবিন্দবাবু একটা ফাইল খুলে দিবাকরের দেওয়া চিঠিটা তার মধ্যে রাখলেন। তারপর জগাকে দেখে বললেন—'অফিস-ঘরটা বন্ধ করে দে। আমি স্যারকে নিয়ে ভেতরে যাচ্ছি।'

গোবিন্দবাবু দিবাকরকে নিয়ে অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের একপাশে একটা কোয়ার্টারে ঢুকলেন। দিবাকরকে একটা চেয়ারে বসিয়ে তিনি বললেন—'আজ আর আপনার কোয়ার্টারে আপনাকে যেতে দিচ্ছি না। সেটা কাল সকালে ঝাড়পোঁছ করিয়ে দেব। আজ আমার এখানেই আপনার থাকা আর খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। এখানকার যা হোটেল তাতে আপনি খেতে পারবেন না। কাল সকালেই আপনার রান্নার একটা লোক যোগাড় করে দেব। সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

গোবিন্দ তরফদারের ব্যবহার আর তাঁর আপ্যায়ন ভালই লাগল দিবাকরের। সে আর না বলতে পারল না।

পরদিন সকালেই দিবাকরের কোয়ার্টার ধোয়া-মোছা হয়ে গেল। একজন বয়স্কা মহিলাকে ঠিক করা হল তার রান্না-বান্না করে দেওয়ার জন্যে। সব ব্যবস্থা গোবিন্দবাবুই করলেন। গোবিন্দ-বাবুর ওখানেই সকালের চা-জলখাবার খেয়ে সে তার নিজের কোয়ার্টারে চলে গেল।

গ্রামীণ হাসপাতাল হলেও হাসপাতালটা ভালই মনে হল দিবাকরের। হাসপাতালে ছোটখাট একটা অপারেশন থিয়েটারও রয়েছে।

মায়ের অন্তিম ইচ্ছাটা সে এখানে থেকে পূরণ করতে পারবে এটা ভেবে বেশ ভালই লাগল তার। গ্রামের সহজ সরল লোক-গুলোকে রুগী হিসেবে পেয়ে তাদের সেবা করতে পেরে খুব আনন্দই লাগছিল তার। সকালে-বিকেলে এমনকি রাতেও সে রুগীদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

একদিন রাত প্রায় তখন বারটা। দিবাকর খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে না পড়লেও চোখে একটা ঘুম-ঘুম ভাব। হঠাৎ জগার ডাকে সে অন্ধকারে চোখ মেলে তাকাল।

জগা তখনও ডেকে যাচ্ছে—'ডাক্তারবাবু, একবার উঠুন! হাসপাতালে একটা সিরিয়াস রুগী এসেছে।'

দিবাকর তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে খোলা জানলার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—'কী হয়েছে রে, জগা?'

জগা এবার জানলার কাছে এগিয়ে এসে বলল—'হাসপাতালে একটা রুগী নিয়ে এসেছে। অবস্থা খুব খারাপ। যন্ত্রণায় সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে।'

'তুই হাসপাতালে যা। আমি আসছি'—বলেই দিবাকর তাড়াতাড়ি শোবার পোশাকটা বদল করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

হাসপাতালে এসে দেখল একজন আঠাশ-ত্রিশ বছরের যুবক যন্ত্রণায় চিৎকার করছে আর বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে।

দিবাকর রুগীকে পরীক্ষা করল। তারপর রাতের কর্তব্যরতা নার্স মিলিকে বলল—'এখুনি অপারেশন করতে হবে। আপনি ও. টি. নার্সকে ডেকে আনুন।'

মিলিকে ইতস্তত করতে দেখে জগাই বলল—'শেলী দিদিমণি তো এখানে থাকেন না।'

জগার কথায় দিবাকর তার দিকে তাকাল। চোখাচোখি হতেই জগা আবার বলল—'ও. টি. দিদিমণি হেতমপুরের কাছে থাকেন। বলেন তো গিয়ে ডেকে নিয়ে আসি। অবশ্যি অনেকটা পথ তো, ডেকে নিয়ে আসতে একটু দেরি হবে।'

দিবাকর সঙ্গে সঙ্গে বলল—'তাই কর, জগা। যত তাড়াতাড়ি পারিস তাকে নিয়ে আসবি। অযথা এতটুকু যেন দেরি না হয়।'

জগা বেরিয়ে গেলে দিবাকর অপারেশন থিয়েটারে ঢুকল। তার পেছন পেছন মিলিও এসে তার পাশে দাঁড়াল।

মিলি যেন কিছু বলতে চায়। দিবাকর সেটা বুঝতে পেরে মিলিকে জিজ্ঞেস করল—'আমাকে কিছু বলবেন?'

মিলি একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল—'অপারেশন রিস্কটা কি না নিলেই নয়, স্যার?'

দিবাকর মিলির এধরনের অনুরোধের কারণটা বুঝতে পেরে বলল—'সে কথা যে আমিও ভাবিনি, তা নয়। এরকম অপারেশন থিয়েটারে এধরনের অপারেশন করা রিস্ক তো বটেই, কিন্তু রুগীর যা কণ্ডিশন তাতে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে সদর হাসপাতালে পাঠাতে গেলে রুগীকে সে-পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। আমাদের অ্যাম্বুল্যান্সটাও খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কাজেই এখনই রুগীকে শিফ্‌ট করা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব রিস্ক আমাকে নিতেই হবে। আপনি বরং আমাকে একটু হেল্প করুন।' —বলেই দিবাকর অপারেশন পোশাক পরে অপারেশন টেবিলটার ওপর সব গোছগাছ করতে শুরু করল। মিলিও যতটা পারল দিবাকরকে সাহায্য করল।

ইতিমধ্যে জগা শেলীকে নিয়ে এসেছে। দিবাকর আর দেরি করল না। রুগীকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যেতে বলল। আর শেলীকে তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নিয়ে অপারেশন টেবিলে তাকে আসতে বলে নিজে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

অপারেশন শেষ করে ওরা যখন বেরিয়ে এল রাত তখন প্রায় তিনটে। বাকি রাতটা দিবাকর রুগীর পাশে বসেই কাটিয়ে দিল।

পরদিন সকালে তখন প্রায় ৭টা, রুগীর জ্ঞান ফিরে এল। এতক্ষণ দিবাকর রুগীর পাশেই ছিল। রুগীকে কিছুটা ভাল বলেই মনে হল। এবার সে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। গোবিন্দবাবু

দিবাকরের কাছে এসে বললেন—'আপনি তাজ্জব করলেন, স্যার! এ ধরনের অপারেশন এ হাসপাতালে এই প্রথম।'

দিবাকর কোন মন্তব্য না করে গোবিন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

সকালের চা-জলখাবার খেয়ে সে যথারীতি আউটডোর পেশেণ্ট-দের নিয়েই কাটিয়ে দিল। আউটডোরের কাজ শেষ করে সে একবার বেডের রুগীদের দেখতে গেল। যে ছেলেটিকে অপারেশন করা হয়েছে সে এখন বেশ ভালই আছে বলে মনে হল। তবু নার্সকে ডেকে বলল—'যদি ছেলেটি খুব ব্যথা অনুভব করে তাহলে যেন ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়।'

দিনকয়েক বাদে ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেল। এই ঘটনার পর দিবাকরের নাম লোকের মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পলাশপুর আর তার পাশাপাশি গ্রামগুলির প্রতিটি মানুষ তাকে তাদের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিল। একজন ডাক্তারের জীবনের চরম পাওনা সে প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে নিজের নিষ্ঠা আর একাগ্রতার গুণে আদায় করে নিল।

কিন্তু আজকের সমাজে দিবাকরদের বড় অভাব। নীতি, নিষ্ঠা আর ভালবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করার নজির আজকের সমাজে একান্ত বিরল। হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থপরতা যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে সেখানে দিবাকরের মতো লোকেরাই বা কতদিন টিঁকে থাকতে পারবে!

একদিন কী ভেবে দিবাকর কোয়ার্টার অ্যালটমেণ্টের খাতাটা খুঁজে আলমারি থেকে বের করল। কিন্তু সে-খাতায় গোবিন্দবাবুর নামে কোন কোয়ার্টার অ্যালট করা হয়েছে বলে দেখা গেল না। যে-কোয়ার্টারে গোবিন্দবাবু আছেন তার তিনটি ঘর তিনজন নার্সের নামে দেখান আছে। অথচ দিবাকর জানে কোন নার্সই হাসপাতাল কোয়ার্টারে থাকে না। কিন্তু সে এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করে খাতাটা যেমন এনেছিল তেমনি আবার যথাস্থানে

রেখে দিল।

একদিন কথায় কথায় দিবাকর গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা গোবিন্দবাবু, এখানে ও. টি. রয়েছে, ও. টি. নার্স রয়েছে। তাছাড়া দুজন জেনারেল বেডের নার্স রয়েছে, অথচ এদের জন্যে কোন কোয়ার্টারের ব্যবস্থা নেই কেন?'

হঠাৎ দিবাকরের এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে গোবিন্দবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি ঝানু লোক। নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে বললেন—'কি মুশকিল! ওরা যে নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছে!'

দিবাকর এবার সরাসরিই গোবিন্দবাবুকে প্রশ্ন করল—'তাহলে নার্সদের জন্যে কোন কোয়ার্টারের ব্যবস্থা এখানে নেই?'

গোবিন্দবাবু এবার আমতা আমতা করে বললেন—'না স্যার, তা ঠিক নয়। তবে পুরো কোয়ার্টারটা ফাঁকা পড়ে আছে—তাই মজুমদারবাবুই বললেন—' কথাটা শেষ না করে তিনি দিবাকরের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিলেন।

দিবাকর আবার প্রশ্ন করল—'তাহলে সে-ফাঁকা কোয়ার্টার কোনটা?'

গোবিন্দবাবু দেখলেন এবার সঠিক কথাটা না বলে পারা যাচ্ছে না। তাই তিনি দুহাত কচলে বিনীতভাবে বললেন—'ছেলে-পুলে নিয়ে আছি, স্যার। তাই মজুমদারবাবু বললেন—মিছিমিছি কতগুলো ভাড়া গুনে লাভ কি! কোয়ার্টারটা যখন খালিই পড়ে রয়েছে তখন আমিই যেন ঐ কোয়ার্টারটায় থাকি। ব্যবহারে থাকলে বাড়িটাও ভাল থাকবে—তাই আমিই ঐ নার্সদের কোয়ার্টারে আছি স্যার।'

'ও!' বলেই দিবাকর থেমে গেল। এ ব্যাপার নিয়ে আর কথা বাড়াল না।

কমলেশ মজুমদার পলাশপুরের এক প্রভাবশালী লোক। ওপর মহলে তাঁর ক্ষমতাও প্রচণ্ড। ইচ্ছে করলে তিনি দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে পারেন। তিনি পলাশপুর গ্রামীণ হাসপাতাল কমিটির সভাপতি। দিবাকর হাসপাতালে যোগদান করার পর আজই প্রথম কমিটির মিটিং। দিবাকর ঠিক করল আজকের মিটিং-এ নার্সদের কোয়ার্টারের প্রসঙ্গটা তুলবে। যেটা এখন আছে সেটা বেআইনী। গোবিন্দবাবু কোয়ার্টারটা পুরো দখল করে আছেন—বাড়ি ভাড়া ভাতাও পুরো নিচ্ছেন—অথচ কোয়ার্টারের অভাবে নার্সদের বাইরে থাকতে হচ্ছে। তাতে হাসপাতালের কাজকর্মে প্রায়ই অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

সভায় এক সময় প্রসঙ্গটা তুলল দিবাকর। কিন্তু সে প্রসঙ্গটা তেমন গুরুত্ব পেল না। শুধু কমলেশবাবু বললেন—'তেমন যদি মনে হয় তাহলে এখানে ডাক্তারদের দুটো কোয়ার্টার আছে। এখানে কোন সময়ই একজনের বেশি ডাক্তার থাকে না। কাজেই দরকার বোধ করলে ডাক্তারদের খালি কোয়ার্টারটা নার্সরা ব্যবহার করতে পারে। গোবিন্দবাবু এখন যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। পরে এ নিয়ে না-হয় আলোচনা করা যাবে।'

দিবাকর দেখল কমিটির মেম্বারদের সবাই কমলেশবাবুর দলের লোক। সবাই কর্তাভজা গোছের লোক। কমলেশবাবু যা বলছেন তাতেই তাঁদের পূর্ণ সমর্থন। কাজেই এ নিয়ে আর বেশি আলোচনা করা গেল না। হাসপাতালের অসুবিধা—তার প্রতিকার—এ রকম কোন গঠনমূলক আলোচনাও কিছুই হল না। কেবল কিছু ঘরোয়া আলোচনা আর চা-পর্বের পালা শেষ করে সেদিন সভার কাজ শেষ হল।

পরদিন দিবাকর গোবিন্দবাবুকে এসে বলল—'নার্সদের—বিশেষ করে ও. টি. নার্সের হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে থাকা দরকার আমাদের যে খালি কোয়ার্টারটা আছে—যেটা ডাক্তারের কোয়ার্টার—সেখানে সে-রকম কোন ব্যবস্থা করতে হবে।'

গোবিন্দবাবু তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'তাহলে তো ভালই হয়, স্যার। কিন্তু বাড়িটার ছাদটা যে একদম ড্যামেজ হয়ে গেছে। তাছাড়া, দরজা-জানলাও অনেকগুলো রিপেয়ার করা দরকার। আর তা করতে কয়েক হাজার টাকার দরকার। একবার লেখাও হয়েছিল। কিন্তু সরকারের আর্থিক সংকটের জন্যে সেটা কমলেশবাবু আর সরকারের কাছে পাঠাননি। বলেন তো, আর একবার লেখা যাবে।'

দিবাকর বুঝল—কমলেশবাবু সব জেনেশুনেও যখন সেই কোয়ার্টারে নার্সদের থাকার ব্যবস্থা করতে বললেন তখন তার মানেই হল তিনি জেগে ঘুমচ্ছেন। কাজেই এর সুরাহা সম্ভব নয়। তবু সে বলল—'ঠিক আছে, তাহলে তাই লিখবেন।'

কোয়ার্টারের ব্যাপারে দিবাকর সেদিন গোবিন্দবাবুকে যে-ভাবে জেরা করে ভেতরের ব্যাপারটা জেনে নিয়েছিল তাতে ঝানু গোবিন্দ তরফদার এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ ডাক্তারটি তেমন সহজ হবে না। তিনি স্টোরকিপার। স্টোর অ্যাকাউণ্টস-এ বেশ কিছু গণ্ডগোল রয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন অডিট হবার আগে সেগুলো ঠিকঠাক করে রাখবেন। কিন্তু তার আগেই দিবাকর হঠাৎ এসে কাজে যোগদান করে বসল। এখন দিবাকর যদি অ্যাকাউণ্টস দেখতে চায় তাহলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। কাজেই এ ব্যাপারে মজুমদারবাবুর সঙ্গে কথা বলা এখনই দরকার। কারণ তিনি যা করেছেন তা মজুমদারবাবুর নির্দেশ অনুযায়ীই করেছেন। গোবিন্দবাবু আর বিলম্ব না করে সেদিন রাতেই কমলেশ মজুমদারের বাড়ি এসে তাঁকে সব ব্যাপারটা জানালেন।

কমলেশবাবু তো রেগে আগুন। তিনি ধমক দিয়ে বললেন—'আপনার দিন দিন কী হচ্ছে বলুন তো গোবিন্দবাবু? জানতাম পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। কিন্তু আপনার বয়স যতই বাড়ছে ততই যেন বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাচ্ছে। এসব ব্যাপারে খাতা-পত্র সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে রাখতে হয়। আপনাদের এ ডাক্তারটিকে দেখে

মনে হচ্ছে সোজা পাত্তর নয়। এ অবস্থায় তিন তিনটি পেটি ওষুধের হিসেব আপনি কিভাবে মেলাবেন বলুন তো ?'

গোবিন্দবাবু কোন জবাব দিলেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাঁকে চুপচাপ দেখে কমলেশবাবুই পুনরায় বললেন—'এক কাজ করুন। ব্যাক ডেট দিয়ে একটা নোট আমার কাছে দিন। আর তারিখটা দেবেন দিবাকর ডাক্তার এখানে আসার আগের। অর্থাৎ হাসপাতালে যখন কোন ডাক্তার ছিল না সেই সময়ের। নোটে লিখবেন—সেই ওষুধগুলোর এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে যাওয়ায় সেগুলো আর স্টকে রাখার কোন মানে হয় না। কাজেই ঐ ওষুধগুলো নষ্ট করে ফেলার অনুমতি দিলে সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি সেইভাবে অনুমতি দিয়ে দেব। ডাক্তার না থাকলে আমার অনুমতিই যথেষ্ট। আপনি সেই অনুযায়ী স্টক থেকে ওষুধগুলো সেই ডেটে বাদ দিয়ে সেখানে একটা নোট রেখে দেবেন। আর আমার অনুমোদনটা ফাইলে রেখে দেবেন।'

কথা শেষ করে কমলেশবাবু গোবিন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললেন—'কি ? ঠিক হল তো ? যান, এবার যেভাবে বললাম তাই করে নিয়ে আসুন।'

গোবিন্দবাবু যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালে কমলেশবাবু আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—'যে ওষুধগুলোর ফলস্ ইস্যু দেখিয়েছেন সেগুলো সব সই-সাবুদ ঠিকঠাক করে রেখেছেন তো ? দেখবেন খুব সাবধান !'

গোবিন্দবাবু উত্তরে বললেন—সেসব ঠিক আছে, স্যার। আমি নোটটা লিখে এখনই আপনার কাছে নিয়ে আসছি।' তারপর একটু থেমে বললেন—'তাহলে আমি এখন আসি, স্যার।' কমলেশবাবু সম্মতি জানালে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গোবিন্দবাবু বেরিয়ে গেলে কমলেশবাবু সোজা ও. টি. নার্স শেলীর বাসায় এসে হাজির হলেন। হাসপাতালে শেলীর ডিউটি

না থাকলে তিনি রোজ রাতেই তার বাসায় আসেন।

কমলেশবাবু বিবাহিত। কিন্তু শেলীকে কেন্দ্র করে স্ত্রী কমলার সঙ্গে বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁর ভীষণ মন কষাকষি চলছিল। প্রায় বছর দুয়েক আগে তিনি তখন হসপিটাল কমিটির সভাপতি, সেই সময় শেলী এসে একদিন তাঁর দেখা করতে চাইল। শেলীকে তিনি এর আগে কোনদিন দেখেননি। কমলেশবাবুর অনুমতি পেয়ে শেলী ভেতরে এসে নমস্কার জানিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

কমলেশবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'বল, তোমার কী দরকার?'

শেলী বিনীতভাবে বলল—'পাশের গাঁ মালঞ্চে আমার বাড়ি। আমি নার্সিং ট্রেনিং-এ আছি। ট্রেনিং শেষ হয়ে আসছে। ট্রেনিং শেষে আমার পোস্টিং অর্ডার হবে। কিন্তু দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিলে আমার ভীষণ অসুবিধা হবে। বাড়িতে বিধবা রুগ্না মা আর একটা ছোট ভাই। আমি দূরে কোথাও চলে গেলে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা খুব কষ্টকর হবে। ওরা ভীষণ বিপদে পড়বে। শুনলাম আপনার হাসপাতালে একজন ও. টি. নার্সের দরকার। আমার ও. টি. ট্রেনিং আছে। আপনি যদি দয়া করে—'

শেলীর কথা শেষ হওয়ার আগেই কমলেশবাবু বললেন—'দেখ, এটা সরকারি হাসপাতাল। এখানকার সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট হেলথ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আমি আমার ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে এখানে একটা অপারেশন থিয়েটার—তোমরা যাকে ও. টি. বল সেটা সংযোজন করতে পেরেছি—যাতে ছোটখাট অপারেশন-গুলো এখানে করা যায়। হেলথ ডিপার্টমেন্ট কোন ও. টি. নার্স আমাকে এখনও দিতে পারেনি। আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ইদানীং যোগাযোগ করেছি। একজন ও. টি. নার্স ওরা আমাকে দেবে বলে কথা দিয়েছে।' কমলেশবাবুর বক্তব্য শুনে শেলী আশান্বিত হয়ে বলল—'স্যার! আপনি শুধু একটু বললেই আমার

পোস্টিং তাহলে এখানে হতে পারে। আমার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে আপনি নিশ্চয়ই আমার এ উপকারটুকু করবেন।'

কমলেশ মজুমদার বিনা স্বার্থে কারও কোন উপকার কোনদিন করেননি। সেদিন শেলীর উচ্ছল যৌবনের দিকে তাকিয়ে তাকে কাছে টানার একটা উগ্র বাসনা গোপনে তাঁর মনে পেয়ে বসল। তিনি সেদিন শেলীকে কথা দিয়েছিলেন এবং নিজের প্রভাব খাটিয়ে শেলীকে হাসপাতালে পোস্টিং করিয়েছিলেন।

কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই শেলীর সেই দারিদ্র্যের দুর্বলতার সুযোগকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করলেন। তিনি শেলীকে হাসপাতালের কোয়ার্টারে না রেখে আলাদা একটা বাড়ি ঠিক করে দিলেন। বাড়িটা অবশ্য কমলেশবাবুর নিজেরই। শেলী সেখানে একা থাকে। মা-ভাই দেশের বাড়িতে।

শেলীর সেই নিঃসঙ্গ কুমারী নারী জীবনের সঙ্গী এখন কমলেশ মজুমদার। সকালে বিকালে যখনই শেলীর ডিউটি থাকে না তখনই তাঁকে দেখা যায় শেলীর বাড়িতে। এ নিয়েই স্ত্রী কমলার সঙ্গে কলহের সূত্রপাত। আর সেই কলহ যতই বাড়তে লাগল শেলীর প্রতি কমলেশ মজুমদারের আসক্তি ততই যেন দানা বাঁধতে শুরু করল। এখন স্বামী-স্ত্রীতে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

প্রথম প্রথম কমলেশ মজুমদারের যখন তখন তার বাড়িতে আসাটা শেলী পছন্দ করত না। সে পরোক্ষভাবে তার আপত্তির কথাও জানিয়েছে। কিন্তু কমলেশ মজুমদার সে আপত্তিকে এতটুকুও আমল দেননি। শেলী তখন নিরুপায়। কারণ কমলেশ মজুমদারের ওপর মহলে প্রভাবের কথা চিন্তা করে তাকে মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে কমলেশ মজুমদার ইচ্ছে করলে তার এই চাকরিটা যে কোন মুহূর্তেই খেয়ে দিতে পারেন।

সেদিন গোবিন্দবাবু চলে যাওয়ার পর কমলেশবাবু যখন শেলীর বাসায় এলেন তখন স্টোভে সে তার রাতের খাবার তৈরি

করছে। কমলেশ মজুমদার একটা মোড়া টেনে নিয়ে তার পাশে বসলেন। শেলী কমলেশবাবুকে দেখে বুক থেকে সরে যাওয়া আঁচলটা টেনে ঠিক করে নিল। কমলেশবাবু তখনও সেদিকে তাঁর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। শেলী মুখ তুলে তাকাতেই দুজনার চোখাচোখি হয়ে গেল।

কমলেশবাবু একটু হেসে বললেন—'জান, তোমাদের দিবাকর ডাক্তার চাইছে তুমি এখান থেকে উঠে গিয়ে হাসপাতালের কোয়ার্টারে থাক।'

শেলী ভাতের হাঁড়িটা স্টোভ থেকে নামাতে নামাতে বলল—'তিনি তো ঠিকই বলেছেন। এখানে থাকলে অনেক অসুবিধে তো হয়ই। রাতবিরেতে দরকার হলে তাঁকে এতদূরে লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে হয়। রোগীদের ব্যাপারে ভদ্রলোক খুব সিরিয়াস।'

কমলেশবাবু একটু রাগের ভান করে বললেন—'আরে, রাখ তো! ওরকম সীরিয়াস কত দেখেছি। ছোকরা সবে পাশ করে তো চাকরিতে ঢুকেছে। দু-চার মাস যাক। তখন বোঝা যাবে কত সীরিয়াস।' তারপর তিনি হেসে বললেন—'খুব সাবধান, ছোকরা বিয়ে-থা করেনি—শেষ পর্যন্ত আবার তোমার ওপর সীরিয়াস হয়ে না ওঠে!' বলেই তিনি আলতো করে শেলীর নরম গালটা একটু টিপে দিলেন।

শেলী তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হাসল। কমলেশবাবু একটু কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—'তুমি সামনের মাসে বাড়ি যেয়ে তোমার মাকে সব জানাবে। আমি ডিভোর্সের চেষ্টা করছি। সেটা হয়ে গেলেই একদম আমার বাড়িতে। তখন আর দিবাকরের হাসপাতালের কোয়ার্টারে যাওয়ার প্রশ্নই উঠবে না। কি বল?' বলেই তিনি হোহো করে হেসে উঠলেন।

কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ তিনি মোড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আজ আর দেরি করব না। গোবিন্দবাবু হয়তো এতক্ষণে এসে

বসে আছেন।' কথাটা বলে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর প্রায় মাস খানেক বাদে দিবাকর একজন রুগীকে একটা ওষুধ লিখে দিয়ে বলল—'হাসপাতালের স্টোর থেকে ওষুধটা নিয়ে যেও। গোবিন্দবাবুকে দেখাবে। তিনি দিয়ে দেবেন।'

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে রুগীটি ফিরে এসে জানাল—'ওষুধটা স্টোরে নেই। গোবিন্দবাবু বললেন—ফুরিয়ে গেছে।'

দিবাকর কথাটা শুনে ভাবল—সেকি! মাত্র কয়েকদিন আগে এই দামী ওষুধটার মাত্র কয়েকটি ফাইল হাসপাতালে এসেছে। সে অনেক চেষ্টা করে কয়েকটা ফাইল আনাতে পেরেছিল। এরই মধ্যে ওষুধটা শেষ হয়ে গেল! সে গোবিন্দবাবুকে ডেকে পাঠাল। গোবিন্দবাবু এলে সে প্রেসক্রিপশনটা তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল —'আচ্ছা গোবিন্দবাবু, এই ওষুধটা কি আমাদের স্টোরে নেই? এটা দামী ওষুধ। এটা প্রেসক্রাইব করলে আমি স্টোর থেকেই নিতে বলি। ডিসপেনস্যারির জন্যে এটা রিকুইজেশন পাঠাই না।'

গোবিন্দবাবু বিনীতভাবে বললেন—'হ্যাঁ স্যার, জানি। তবে ওষুধটার কয়েকটা মাত্র ফাইল এসেছিল। এর আগে যা প্রেসক্রিপশন করেছেন তাতেই সব শেষ হয়ে গেছে। আমার খাতায় সব নোট করা আছে।'

গোবিন্দবাবুর কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারল না দিবাকর। কিন্তু এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে আর কিছু না বলে রুগীটিকে বলল—'ওষুধটা এখন আমাদের এখানে নেই। তুমি যদি কিনে নিতে পার নিও। আর তা নাহলে পরে দেখব কী করা যায়।' রুগীটি দিবাকরকে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

গোবিন্দবাবুও যাওয়ার জন্যে উদ্যত হলে দিবাকর তাঁকে বলল —'গোবিন্দবাবু, আপনার স্টোরের খাতাপত্রগুলো আজ সন্ধ্যায় আমার কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবেন। সেগুলো দেখে কী কী ওষুধ আমাদের দরকার তার একটা লিস্ট করে রিকুইজেশন পাঠাতে হবে।'

গোবিন্দবাবু 'যে আজ্ঞে' বলে সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে

গেলেন।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দিবাকর স্টোরের খাতাপত্র নিয়ে বসল। প্রথমেই সে সকালের প্রেসক্রিপশনের ওষুধটার স্টক পজিশন দেখার জন্যে রেজিস্টারের পাতাটা খুলল। দেখা গেল বিভিন্ন তারিখে ওষুধের ফাইলগুলো বিভিন্ন লোককে দেওয়া হয়েছে। দিবাকরের মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হল। তার বেশ মনে আছে এ ওষুধটা সেমাত্র দু-তিন জনকে দেবার জন্যে প্রেসক্রাইব করেছিল। তাহলে কি ভুয়ো নাম ঢুকিয়ে ওষুধগুলো বের করে নেওয়া হয়েছে? সে আরও দুটা পাতা উল্টাল। হঠাৎ এক জায়গায় দেখা গেল বেশ বড় রকমের একটা স্টক—ডেট একস্পায়ার করেছে এই নোট রেখে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাপারগুলো দিবাকরের কাছে কেমন যেন গোলমেলে ঠেকল। সে খাতাপত্র রেখে কিছুক্ষণ বসে বসে কী যেন ভাবল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে খেয়ে, বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে দিবাকর ভাবল এ ব্যাপারগুলো কমলেশবাবুর নজরে আনা দরকার। তিনি পরিচালক কমিটির সভাপতি। হাসপাতালের ডাক্তার হিসেবে এসব তাঁকে জানান কর্তব্য। সে তখনই কমলেশবাবুর বাড়িতে চলে গেল।

কমলেশবাবু সব শুনলেন। তিনি চেয়ারটায় একটু নড়ে-চড়ে বসে বললেন, 'শোন ডাক্তার—' বলেই তিনি একটু থামলেন। তারপর হেসে আবার বললেন—'তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। 'তুমি' বলায় কিছু মনে করনি তো?'

দিবাকর বুঝল এটাও তাঁর একটা চাল। তাকে কাছে টানার জন্যেই হয়তো তাঁর এ অভিনয়। তবু সোৎসাহে সে বলল—'না, না। আপনি আমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবেন।'

এবার কমলেশ মজুমদার বললেন—'তুমি যা বলছ তাহলে তো বেশ ভাবনার কথা। এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাসপাতালটা করা হল—অথচ সেখান থেকে এভাবে ওষুধ নষ্ট হবে—লোকে

পাবে না—এ তো হতে পারে না। তুমি গোবিন্দবাবুকে বল তিনি যেন এ ব্যাপারে একটু বিশেষ নজর রাখেন। তুমি ডাক্তার। তোমার এ নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে কেন?'

দিবাকর একটু রাগত স্বরেই এবার বলল—'এখানে যা ঘটছে তাতে আমাকে মাথা ঘামাতেই হবে, আর আপনাকেও একটু এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে।'

দিবাকর রাগলেও কমলেশবাবু কিন্তু একটুও রাগলেন না। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই বললেন—'তবে তুমি ঐ যে ভুয়ো নাম দেখিয়ে কী করা হয়েছে বলছিলে না?—সেটা হয়ত ঠিক নাও হতে পারে। কারণ তুমি কবে কাকে কী ওষুধ দিয়েছ তা কি আর মনে রাখা সম্ভব!—না কেউ রাখতে পারে? আর ঐ যে বাতিল করা হয়েছে ওষুধগুলো—ওগুলো আমিই বাতিল করতে বলেছিলাম। বুঝলে ডাক্তার, আজকাল সব জায়গাতেই কাজে নেগলিজেন্স। ওষুধগুলো পড়ে রইল—অথচ ডিপার্টমেন্টের লোকগুলো দেখল না সেগুলো কবে পর্যন্ত ব্যবহার করা চলবে। দিল পাঠিয়ে এখানে-সেখানে। মফস্বল বলেই সম্ভব। এখানকার লোকের জীবনের তো আর কোন দাম নেই!'

দিবাকর কমলেশবাবুর কথার রেশ টেনেই বলল—'তাই যদি হয়, তাহলে হেলথ ডিপার্টমেন্টকে আমাদের ব্যাপারটা জানান দরকার ছিল, এবং ঐ ওষুধের বিনিময়ে নতুন ওষুধ দাবি করা উচিত ছিল।'

কমলেশবাবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন—'কাকে লিখবে তুমি বল? কে তোমার লেখার জবাব দেবে। তোমরা ভাব আমার খুব প্রভাব। আমি বললেই সব হয়ে যাবে। তা নয়। দিনকাল পাল্টে গেছে। কলেজ জীবনের স্বপ্নময় জগৎ থেকে সবে বাস্তবে প্রবেশ করেছ। তখন ন্যায়-নীতির যে প্রশ্ন তুলতে তা এখন ভুলে যাও। বাস্তব জগৎটা বড় কঠিন আর এলোমেলো। এখানে সব জিনিস বুঝে উঠতে পারবে না। এ সব নিয়ে লেখালেখি

করতে যাওয়া মানেই নিজেদের ক্ষতিকে ডেকে আনা। অপরের অন্যায়কে খুঁচিয়ে দেখতে গেলে কে না বিরক্ত হয়? তাহলে ছিটেফোঁটা ওষুধ যা পাচ্ছ তাও কি আর পাবে?'

দিবাকর দেখল সে যতই চেষ্টা করুক এঁদের সঙ্গে এঁটে ওঠা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। এঁরা অনেক গভীর জলের মাছ। কাজেই সে আর এনিয়ে কোন বচসায় যেতে চাইল না। কমলেশ মজুমদার যে কতটা নীচে নামতে পারে তার প্রমাণ সে পেল আরও প্রায় মাসখানেক বাদে।

বিকেলের দিকে দিবাকর হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত। সেই সময় চার-পাঁচজন ছেলে এসে দিবাকরকে বলল—'ডাক্তারবাবু, শিগ্গির চলুন। কমলেশদার স্ত্রীর অবস্থা খুব খারাপ।'

দিবাকর জিজ্ঞেস করল—'কী হয়েছে কমলেশবাবুর স্ত্রীর?'

ছেলেদের মধ্যে একজন বলল—'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পেটে নাকি যন্ত্রণা হচ্ছিল। এখন বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন। কমলেশদা বাড়িতে নেই। বাড়ির ঝিটা আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

দিবাকর আর কিছু না বলে ওষুধের বাক্সটা নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে কমলেশবাবুর বাড়িতে চলে এল।

কমলেশবাবুর স্ত্রী অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন। মুখ থেকে কেমন একটা গোঙানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মুখ থেকে লালা গড়িয়ে বালিশের একটা অংশ পুরো ভিজে গেছে।

কমলেশবাবুর স্ত্রীর অবস্থা দেখে এবং তাঁকে পরীক্ষা করে দিবাকর ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে জিজ্ঞেস করল—'কমলেশ-বাবু কোথায়? তাঁকে এখনই সংবাদ দেওয়া দরকার।'

ছেলেরা বাইরে ছিল। কমলেশবাবুর ঝি সরলা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল—'দাদাবাবু কোথায় আছেন তা তো বলতে পারছি না। কাল বিকেলে বৌদিমণির সঙ্গে কী নিয়ে যেন দাদাবাবুর খুব কথা কাটাকাটি হয়েছে। চিৎকার চেঁচামেচিও

শুনেছি। তারপর দেখলাম দাদাবাবু বেরিয়ে গেলেন। তারপর থেকে তো আর বাড়ি ফিরে আসতে দেখিনি। রাতের বেলাও ফিরেছিলেন বলে তো মনে হয়নি।'

সরলার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ দিবাকর দেখল কমলেশ-বাবুর স্ত্রীর বালিশের পাশ দিয়ে ভাঁজ করা চিঠির মতো কী একটা বেরিয়ে আছে। সে হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিল। ভাঁজ খুলে খানিকটা পড়ল। তারপর ব্যাপারটা বুঝে সেটাকে আবার ভাঁজ করে পকেটে রেখে সরলাকে বলল—ছেলেদের ডাক, এঁকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আর কমলেশবাবুকে এখনই দরকার। এঁর অবস্থা মোটেই ভাল নয়।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সে ছেলেদের বলল—'তোমরা এখনই এঁকে হাসপাতালে নিয়ে এস। আর কমলেশবাবুকে যে করেই হোক সংবাদ দাও। কারণ এঁর অবস্থা মোটেই ভাল ঠেকছে না। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। তোমরা এখনই এঁকে নিয়ে এস। বাড়িতে রেখে এঁর যা অবস্থা তাতে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। আর এ অবস্থায় সদর হাসপাতালে পাঠানও চলবে না।'

হাসপাতালে এসে দিবাকর পকেট থেকে ভাঁজ করা চিঠিটা বের করে একবার পড়ে নিল। চিঠিটা কাউকে সম্বোধন করে লেখা নয়। শুধু লেখা রয়েছে ঃ

'এ আমার অভিযোগ পত্র নয়—আমার জবাবদিহিও নয়। সবার অলক্ষ্যে দিনের পর দিন যে অশান্তির আগুনে আমি জ্বলে-পুড়ে মরেছি এ তারই জবানবন্দি। গত এক বছর ধরে যে মানসিক জ্বালা আমাকে তুষানলের ন্যায় ভেতরে ভেতরে অসহ্য দহন-জ্বালা দিয়েছে তা আমি মুখ বুজে সহ্য করেছি—কাউকে তার কারণ কোন দিন জানতে দিইনি। আমাদের দশ বছরের বিবাহিত জীবনের শেষের এই একটি বছরের অভিজ্ঞতা আমার বিগত দাম্পত্য জীবনের সব স্বপ্ন ও সাধকে আজ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আমি আজ নিঃস্ব—বড়ই নিঃসঙ্গ।

স্বামীর জীবন থেকে আমার প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে গেছে তখন সেই অপ্রয়োজনীয় জীবনের বোঝাটাকে বয়ে নিয়ে যেয়ে আর লাভ কি? তাই মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার জীবনের পুঞ্জীভূত দুঃখের কারণটা আজ সকলের কাছে জানিয়ে যেতে চাই। তা না হলে আমার আত্মঘাতিনী হওয়ার কারণটা চিরকাল সকলের কাছে কুয়াশাচ্ছন্নই থেকে যাবে।

আমার স্বামী আজ অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। স্ত্রী হিসেবে কোন নারীই বোধ হয় তার স্বামীকে অন্য নারীর হাতে সঁপে দিতে পারে না। আমিও পারিনি। তাই আমাদের সুখের দাম্পত্যজীবনে ঘনিয়ে এল এক মহানিশার অন্ধকার—যে অন্ধকারে আমি হারিয়ে গেলাম আমার স্বামীর জীবন থেকে। ইদানীং সে প্রায়ই রাতে বাড়ি ফিরত না। বহু বিনিদ্র রজনী আমি কাটিয়েছি তার পথ চেয়ে। কিন্তু ফেরাতে আমি তাকে পারিনি। স্ত্রী হিসেবে এটা হয়তো আমার ব্যর্থতা! কিন্তু বিশ্বাস করুন—চেষ্টার ত্রুটি আমি করিনি। পরে সে একদিন পরিষ্কার আমাকে জানিয়ে দিল আমাকে তার কোনই প্রয়োজন নেই। সে আবার নতুন করে তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমার কাছ থেকে সে মুক্তি চায়। তাই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে মুক্তি না দিয়ে আজ গণ-আদালতকে সামনে রেখেই আমি তাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম।

ইতি—হতভাগিনী কমলা।"

পড়া শেষ করে দিবাকর চিঠিটা আবার ভাঁজ করে তার পকেটে রেখে দিল। ইতিমধ্যে ছেলেরা কমলেশবাবুর স্ত্রী কমলাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে এসেছে। দিবাকর তাড়াতাড়ি তাঁকে একটা বেডে শুইয়ে দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। সে বুঝল পূর্বে সে যা ভেবেছিল তাই। কমলা বিষ খেয়েছে। তাঁর সমস্ত দেহে বিষের ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। দিবাকর নানা ভাবে চেষ্টা করল—কিন্তু তাতে তেমন কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কমলার শরীর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে এল। ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে ওঠার আগেই কমলার জীবন-প্রদীপ নিভে গেল।

কমলেশবাবু যখন এলেন তখন কমলার প্রাণহীন দেহটা একটা সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তিনি এসে দিবাকরকে জিজ্ঞেস করলেন—'কী ব্যাপার ডাক্তার?'

দিবাকর কমলেশবাবুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল—'কমলাদেবী বিষ খেয়েছিলেন।' সে আর কিছু বলল না। সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের কোয়ার্টারে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে কমলেশবাবু দিবাকরের কোয়ার্টারে একাই এসে হাজির হলেন। দিবাকর একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে কী ভাবছিল। কমলেশবাবুকে দেখে বলল—'আসুন।'

কমলেশবাবু তার কাছে এসে বললেন—'ডেড-বডি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ন্যাচার্যাল ডেথ্ বলে একটা ডিসচার্জ সার্টিফিকেট লিখে দাও।'

কমলেশবাবুর কথায় দিবাকর চোখ তুলে তাকাল। তারপর খুব আস্তে করে বলল—'আপনার স্ত্রীর ন্যাচার্যাল ডেথ নয়। এ অবস্থায় ও ধরনের সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না।'

কমলেশবাবু বললেন—'তাহলে ডেড-বডি এমনি নিয়ে যাচ্ছি।'

দিবাকর তেমনি ভাবেই বলল—'না, তাও হয় না।'

কমলেশবাবু এবার একটু বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। কিন্তু সে ভাবটা বাইরে প্রকাশ না করে তিনি বললেন—'তুমি তাহলে কী করতে চাও?'

দিবাকর কোন রকম দ্বিধা প্রকাশ না করে বলল—'ডেড-বডি আমি পোস্টমর্টেম করতে পাঠাব এবং তা আজই। আপনি যা বলছেন তা বেআইনী।'

কমলেশবাবু এবার রাগে ফেটে পড়লেন—'তুমি কাকে আইন দেখাচ্ছ ডাক্তার? এখানকার আইন আমার হাতে। তুমি ভাবছ আমায় বেকায়দায় ফেলবে! তাইতো?'

দিবাকর একটুও উত্তেজিত হল না। সে সহজভাবেই বলল—'আপনি বেকায়দায় পড়বেন কেন? উনি তো আত্মহত্যা করেছেন। সেটা প্রমাণ হলে আপনার ঝামেলা কোথায়?'

ঝামেলা যে কোথায় সেটা বলতে যেয়েও কমলেশবাবু থেমে গেলেন। সেদিকে না যেয়ে তিনি বললেন—'তুমি স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিতে না পার তো—আমি অবিনাশ ডাক্তারকে দিয়ে সার্টিফিকেট নিয়ে নেব। তুমি ডেড-বডি ছেড়ে দাও। ছেলেরা অপেক্ষা করছে।'

দিবাকর তেমনি স্বাভাবিকভাবেই বলল—'আপনার স্ত্রীর এখনও কোন অ্যাডমিশন এণ্ট্রি করা হয়নি। আপনি ইচ্ছে করলেই ডেড-বডি নিয়ে যেতে পারেন।'

কমলেশবাবু দিবাকরের কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কী যেন ভাবলেন। তারপর 'তাই নিয়ে যাব' বলে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কমলেশবাবু অত্যন্ত ধড়িবাজ লোক। দিবাকরের ঐ সহজ সম্মতিকে তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি। দিবাকর তাঁকে কোন বিপাকে ফেলতে চাইলে তিনিও যাতে দিবাকরকে নাস্তানাবুদ করতে পারেন এমন একটা ব্যবস্থা তিনি পাকাপোক্তভাবে করে রাখতে চান।

তখন রাত প্রায় ন'টা। কমলেশবাবু তখনও ফিরে আসেননি। কমলার মৃতদেহ নিয়ে কী করা যায় তাই ভাবছে দিবাকর। হঠাৎ তার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবল কমলেশবাবু ফিরে এলেন। কিন্তু দরজা খুলতেই সে দেখল এক সুন্দরী যুবতী তার দরজায় দাঁড়িয়ে। দিবাকরের কিছু বলার আগেই সে দিবাকরকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দিবাকর বিস্মিত হয়ে 'আপনি কে? কী চাই আপনার?' বলতে বলতে তার দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটি কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তার ব্লাউজের হুকগুলো পটাপট খুলে ফেলে ব্লাউজের

খানিকটা অংশ টেনে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে শাড়ির আঁচলটা লুটতে লুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চুলগুলো এলোমেলো করে নিয়ে সে নিজের মনেই বেশ জোরে জোরে বলতে লাগল—'ছিঃ ছিঃ, লেখাপড়া জানা ডাক্তার! অমন ডাক্তারের মুখে ছাই! কালই আমি ওর চরিত্রের কথা সবাইকে জানিয়ে দেব।'

মেয়েটি আরও যেন কী সব বলতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় কমলেশবাবু এসে হাজির। পেছনে তার আট-দশটা ষণ্ডামার্কা ছেলে। তিনি আসতেই মেয়েটি কৃত্রিম কান্নার ভান করে তাঁকে কী যেন বলল। শুনে ছেলেগুলো খেপে উঠতেই তিনি তাদের শান্ত করে বললেন—'হিংসার পথ একদম নেবে না। ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও।' তারপর মেয়েটিকে বললেন—'আজ আমার বড় বিপদ। শুনেছ নিশ্চয়ই সব। পরে আমার সঙ্গে কথা বল। আমি ডাক্তারের সঙ্গে এখনই কথা বলছি।' তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'এখনই ডাক্তারের সঙ্গে অপ্রীতিকর কোন ব্যবহার কর না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি। তোমরা ডেড-বডির কাছে চলে যাও।'

ঘটনার আকস্মিকতায় দিবাকর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝল তাকে জব্দ করার জন্যেই কমলেশ মজুমদারের এটা একটা নোংরা চক্রান্ত। অন্ধকারে সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের সব কথাই শুনেছে। সে অন্ধকারের মধ্যেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

কমলেশবাবু দরজার সামনে এসে হাঁক দিলেন—'কি হে ডাক্তার! এখনও ঘোর কাটেনি? আর অন্ধকারে কেন? এবার আলো জ্বালাও।'

কমলেশবাবু দরজায় উঠে এলে দিবাকর সুইচ টিপে লাইটটা জ্বালল। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

কমলেশবাবু নিজেই আবার বললেন—'বিয়ে-থা করনি। এরকম একটু আধটু চিত্তচাঞ্চল্য ঘটা স্বাভাবিক। ছেলেগুলো তো খেপে

লাল। বলছিল এখনই থানায় খবর দিয়ে শ্লীলতাহানির দায়ে তোমাকে পুলিসের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু আমি তা হতে দিইনি। তোমার-আমার প্রেসটিজ লোকের কাছে ক্ষুণ্ণ হোক সেটা আমি যেমন চাই না তুমিও নিশ্চয়ই সেটা চাও না। তুমি যখন আমাকে বিপাকে ফেলতে চাও না—ডেড-বডিটা এমনি নিয়ে যেতে বলছ—তখন তোমাকে তো আর আমি এই নোংরা ব্যাপারটায় জড়িয়ে দিতে পারি না।' বলেই তিনি দিবাকরের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন—'কি বল, ঠিক বলিনি ?'

দিবাকর তার কোন জবাব না দিয়ে শুধু আস্তে আস্তে বলল—'আপনি ডেড-বডি নিয়ে যান। আমাকে এবার একটু একলা থাকতে দিন।' বলেই সে দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। কমলেশবাবুও আর কিছু না বলে বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন।

কমলেশবাবু দরজার বাইরে এলে দিবাকর তাঁকে ডেকে বলল—'এটা নিয়ে যান।' বলেই সে তাঁর স্ত্রীর লেখা চিঠিটা পকেট থেকে বের করে কমলেশবাবুর হাতে দিল। তারপর কমলেশবাবুর মুখের ওপরেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল।

পরের দিন ভোরের আলো ফোটার আগেই দিবাকর কমলেশ-বাবুর কাছে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে জগার হাতে দিয়ে প্রথম বাসেই স্টেশনের দিকে বেরিয়ে গেল। সে যখন স্টেশনে পেঁছিল তখন ভোরের আকাশ সূর্যোদয়ের প্রথম কিরণচ্ছটায় লাল হয়ে উঠেছে।

* * *

জেনেও যা জানে না

নিজের সুজলা-সুফলা জন্মভূমি আজ স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে নরেন বিশ্বাসের মনে। সে স্মৃতি বেদনার—প্রিয়জনদের হারানোর ব্যথায় সিক্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পূর্ববাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত হয়ে বেদনা-বিধুর মন নিয়ে সে নতুন করে আশ্রয় নিয়েছে পশ্চিমবাংলায়—কলকাতার কাছেই এক রিফিউজি কলোনিতে। নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি সব ফেলে রেখে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় পালিয়ে এসেছিল তারা। এখানকার এক আত্মীয়ের সামান্যতম আর্থিক সাহায্য তাদের এখন একমাত্র ভরসা।

সেদিনের দৃশ্যটা মনে পড়লে নরেন আজও ভয়ে শিউরে ওঠে। চোখের সামনেই খুন হয়েছিলেন বাবা। দাদা-বৌদির যুগল মৃতদেহ সে পড়ে থাকতে দেখেছে বাড়ির সামনে মাঠে। নিজে সে লুকিয়েছিল একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে। দয়া করে দুর্বৃত্তেরা মারেনি মা আর ছোট্ট ভাইপো সজলকে। তবে তারা শাসিয়ে গিয়েছিল দুদিনের মধ্যে সব ছেড়ে গ্রাম থেকে চলে না গেলে তারা আবার আসবে—প্রাণে মেরে সব লুটেপুটে নিয়ে যাবে।

তাদের দয়াই বলতে হবে! দুদিন সময় তো দিয়েছিল তারা। তা না হলে নরেনকে খুঁজে বের করে মায়ের সামনেই ছেলে আর নাতিকে নৃশংসভাবে খুন করে সেদিনই নরেনের মাকে নিয়ে বিজয় উল্লাসে কেটে পড়তে পারত তারা।

পঞ্চাশের দাঙ্গার ভয়াবহ কাহিনী নরেন তার মায়ের মুখে শুনেছিল। প্রাণের ভয়ে দিনের পর দিন তার বাবা-মা তাদের নিয়ে এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন। তবু বাপ-ঠাকুদার ভিটেমাটি ছেড়ে এদেশে পালিয়ে আসতে চাননি নরেনের বাবা। আবার সকলকে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন নিজের বাড়িতে। আর,

তখনই ঘটে গেল এই ঘটনা। নরেনের মা বিনতাদেবী এরপর আর শ্বশুরের ভিটে আঁকড়ে থাকতে সাহস পেলেন না। স্বামী-পুত্র আর পুত্রবধূকে হারিয়ে পরের দিনই তিনি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এলেন পশ্চিমবাংলায়। সঙ্গে বিশ বছরের ছেলে নরেন আর এক বছরের নাতি সজল।

নরেন তখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। পড়াশোনার পাট উঠিয়ে তাকে জীবন-সংগ্রামে নেমে পড়তে হয়েছে। নিজেদের সব কিছু খুইয়ে একপ্রকার খালি হাত-পায়েই নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তারা এদেশে চলে আসে।

প্রথমে তারা এসে ওঠে যাঁর বাসায় তিনি হলেন নরেনের দূর সম্পর্কের এক মামা। প্রায় মাস দুয়েক সেখানে থাকার পর নরেনের মা বিনতাদেবী নরেনকে বললেন—'এবার একটা বাসা ভাড়া কর নরেন। আমরা সেখানে চলে যাব। ওদের ঘরের অভাব। আমরা থাকায় আরও অসুবিধে হচ্ছে।'

নরেন বাসা খোঁজার আগে মামার সঙ্গে পরামর্শ করল—তাঁর অনুমতি নিয়ে একটা বাসা ভাড়া করে মা ও ভাইপোকে নিয়ে সেখানে উঠে গেল।

সময় এগিয়ে চলে। আর তারই সঙ্গে ফিকে হয়ে আসে অতীত। তখন বর্তমানকে নিয়েই চলতে হয়। আর সেই কারণেই অতীতকে ভুলে সকলেই আঁকড়ে ধরে বর্তমানকে। সজলের দিকে তাকিয়ে নরেনকেও তেমনি তার ফেলে আসা জীবনের বাবা ও দাদা-বৌদির বীভৎস হত্যা দৃশ্যটাকে স্মৃতি হিসেবেই নিজের মনের মধ্যে চেপে রাখতে হয়েছে। এখন বর্তমান নিয়ে তার চিন্তা। সজল বড় হয়ে উঠছে। তাকে স্কুলে ভর্তি করানো দরকার। বেচারার মা-বাবাকে মনেও পড়ে না—জানেও না তার মা-বাবাকে মেরে ফেলার কাহিনী। নরেন ঠিক করল সজলকে ভাল স্কুলে ভর্তি করতে হবে। তাকে ভালভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ

করে তুলতে হবে। সে যখন বড় হয়ে জানতে পারবে সে তার মা-বাবাকে জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার আগেই হারিয়েছে তখন সে যেন কিছুতেই বলতে না পারে মা-বাবা নেই বলে সে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি।

নরেন একদিন মাকে বলল—'মা, সজলের স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে। ওকে আমি একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেব। ভাবছি, কলকাতার কোন একটা নামকরা স্কুলে ওকে ভর্তি করা যায় কিনা।'

বিনতাদেবী ছেলের কথা শুনে বললেন—'সে কি রে! শুনেছি, কলকাতার ঐসব নামকরা বাচ্চাদের স্কুলে পড়াতে হলে অনেক টাকার দরকার। সে টাকা তুই কোথায় পাবি? তাছাড়া, এতটুকু ছেলে! কী করেই বা কলকাতায় যাওয়া-আসা করবে? তুই ওসব চিন্তা ছাড়।'

নরেন কিন্তু মায়ের কথাকে মেনে নিতে পারল না। বলল—'সে তুমি ভেব না, মা। টাকার যোগাড় হয়ে যাবে।' তারপর একটু ভেবে আবার বলল—'ওর যাওয়া-আসার কথা ভাবছ? সে কোন অসুবিধা হবে না। আমাদের এখানকার বেশ কয়েকটি ছোট ছেলে-মেয়ে ঐসব স্কুলে পড়ে। একজন লোক ঠিক করা আছে। সে ওদেরকে দিয়ে আসে। আবার স্কুল ছুটির সময় গিয়ে নিয়ে আসে। তাকে কিছু টাকা দিলে সে সজলের ভারও নেবে।'

বিনতাদেবী তবুও নরেনের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি আবার আপত্তি তুলে বললেন—'না, নরেন। ওসবের দরকার নেই। তুই ওকে এখানকার স্কুলেই ভর্তি করে দে। লেখাপড়ায় আগ্রহ থাকলে তাতেই হবে। ওসব চিন্তা তুই ছাড় দেখিনি।'

নরেন দেখল এ ব্যাপার নিয়ে মায়ের সঙ্গে আর কথা না বাড়ানই ভাল। পরে সব বন্দোবস্ত করে মাকে বুঝিয়ে বললেই চলবে। সে চুপ করে গেল।

পরিস্থিতির দুর্বিপাকে পড়ে নরেনকে লেখাপড়া ছাড়তে

হয়েছে। নিজের আশা সে পূরণ করতে পারেনি—পূর্ণ করার সুযোগ সে পায়নি। তাই নরেন মনে মনে ঠিক করে রেখেছে তার সেই অপূর্ণ আশাকে সে যেমন করেই হোক সজলের ভেতর দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করবে।

দু-চারদিন এ-স্কুল সে-স্কুল করে সে অ্যাডমিশন ফর্ম যোগাড় করল। সজলকে বেশ কয়েকটা স্কুলের অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্নপত্র এনে সেই অনুযায়ী তৈরি করার জন্য বাড়িতে বসে তালিম দিল।

একদিন সে মাকে বলল—'সজলকে কলকাতার কয়েকটা স্কুলে পরীক্ষা দেওয়াব। দেখি, তার মধ্যে কোনটায় ওকে ভর্তি করতে পারি কিনা।'

বিনতাদেবী সেদিনও আপত্তি তুললেন। বললেন—'তুই এ পাগলামি করিস না, নরেন। এতটা সামলাতে পারবি না।'

নরেন একটু হেসে বলল—'দেখি না, কী দাঁড়ায়। তুমি ভেব না। কলকাতার স্কুলে সুবিধে করতে পারলে এখানকার স্কুল তো রয়েছেই। একবার চেষ্টা করে দেখি না। নিজে তো কিছু করতে পারলাম না। সজলটাকে যদি মানুষ করতে পারি তাতেই আমার আনন্দ।'

বিনতাদেবী নরেনের দুঃখটা বুঝতে পেরে চুপ করে গেলেন।

নরেনও লেখাপড়ায় ভাল ছিল। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস—মাঝ পথেই সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এই বয়সেই তাকে জীবন সংগ্রামে নেমে পড়তে হয়েছে। এতে বিনতাদেবীর মনটাও মাঝে মাঝে ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু আজ নরেনের মুখ থেকে ঐ কথা শোনার পর সে দুঃখটা তাঁর মনে যেন নতুন করে আবার দেখা দিল। তাই তিনি দেখলেন, নরেন যদি এতে আনন্দ পায়—যদি তার অতৃপ্ত মনে তৃপ্তি আসে তাহলে তিনি তাতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেন না।

সজল ছেলেবেলা থেকেই খুব চৌকস আর বুদ্ধিমান। নরেনের কাছ থেকে তালিমও পেয়েছিল ভাল। তাই তীব্র প্রতিযোগিতার মাঝেও বেশ একটা নামী স্কুলে সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল।

নরেন তাকে ভর্তিও করে দিল।

সজলকে স্কুলে ভর্তি করানোর পর নরেনের ওপর একটা বাড়তি আর্থিক চাপ এসে পড়ল। সামান্য চাকরির মাইনেতে সে কুলিয়ে উঠতে পারল না। পাড়াতেই দুটো টিউশনি যোগাড় করে তা দিয়েই সে কোনরকমে এই বাড়তি খরচটা চালিয়ে নিতে লাগল।

সজল এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। লেখাপড়ায় সে প্রথম থেকেই ভাল ছিল। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দুই পরীক্ষায়ই সে বেশ উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট করতে পেরেছে। সজলের এই কৃতিত্বে নরেন ভীষণভাবে গর্বিত। সে সজলকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসালো। তার ইচ্ছা সজলকে সে ডাক্তার করবে। সজল ঐ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হল। তারপর যেদিন সজলকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এল, সেদিন সে বাড়ি ফিরে এক বিরাট তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে মাকে বলল—'তুমি দেখে নিও মা, সজল আমাদের একদিন খুব বড় ডাক্তার হবে। আমাদের পরিবারে যা এতদিন কেউ হতে পারেনি সজল আমাদের তাই হবে। সে বিরাট বড় ডাক্তার হবে—কত টাকা উপার্জন করবে। আমাদের তখন আর কোন দুঃখ থাকবে না। তুমি দেখে নিও—সজল নিশ্চয়ই খুব বড় ডাক্তার হবে।'

বিনতাদেবীও কম আনন্দ পাননি। তবে আজকের এই আনন্দের দিনে তাঁর মনে আবার নতুন করে স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধূর কথা মনে পড়ল। খুব স্বাভাবিক কারণেই এই আনন্দের মাঝে অতীতের একটা বিষাদ মলিন দৃশ্য তাঁর মনকে ক্ষণিকের জন্য আনমনা করে তুলল। তাঁর অবচেতন মনের মধ্যে হঠাৎ কে যেন তাঁকে জানিয়ে দিল—আজকের এই দিনটিতে ওরা বেঁচে থাকলে কতই না আনন্দ পেত!

দ্রুতলয়ে সজলের জীবনটা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে তার ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকালে সে দেখতে পাবে কোন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তাকে এখানে এসে পেঁছিতে হয়নি।

সহজ সরল গতিতে কেবল একটিমাত্র লোকের অক্লান্ত চেষ্টা আর পরিশ্রমেই তাকে ধাপে ধাপে এখানে এনে পেঁছে দিয়েছে। সেই লোকটি হল নরেন বিশ্বাস—তার কাকা, যে তাকে দিয়েছে পিতার স্নেহ, মায়ের ভালবাসা আর প্রিয়জনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। ঠাকুরমা বিনতাদেবীও মায়ের স্নেহ-আদর দিয়ে সেই একবছর বয়েস থেকে তাকে লালন-পালন করে তুলেছেন। মায়ের অভাব তিনি তাকে কোনদিনই বুঝতে দেননি। কাজেই মাতৃ-পিতৃহারা হয়েও সংসারের কোন ঘাত-প্রতিঘাতই তার জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি—তাকে কোনদিন বুঝতেও দেওয়া হয়নি যে, কী ভীষণ আর্থিক অনটনের মধ্যে থেকেও কীভাবে তাকে আজ ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

সজলকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার নেশায় নরেন নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখার কোন অবকাশই পায়নি। মা বিনতাদেবী নরেনের বিয়ের জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু নরেন শুধু বলেছে—'এখন নয় মা। সজলকে মোটামুটি একটা জায়গায় এনে দাঁড় করাই—তারপর দেখা যাবে।'

সজল মেডিক্যাল কলেজে এম. বি. বি. এস. পড়ছে। মা একদিন নরেনকে কাছে ডেকে বললেন—'এবার কিন্তু তোর কোন কথাই আমি শুনব না। আমি তোর বিয়ে দেব।'

নরেন হেসে বলল—'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, মা? সজলটা পাশ-টাশ করে বেরুক—একটা চাকরি-বাকরি নিক বা নিজে প্রাকটিস্ শুরু করুক—তখন আমি নিশ্চিন্ত। তখন ওসব বিষয় চিন্তা করা যাবে।'

বিনতাদেবী ছেলের কথায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন—'বলিস কি রে? সজল পাশ করে চাকরি করবে—তারপর তুই বিয়ে করবি? তদ্দিন আমি বেঁচে থাকব? আর তখন কি তোর বিয়ে করার বয়েস থাকবে? এখনই বিয়ে-থা করলে ছেলেপুলে মানুষ করার

সময় পাবিনে—তারপর আবার আরও পাঁচ-সাত বছরের ধাক্কা।'

নরেন তবু মাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলে—'আর কিছুদিন আমায় সময় দাও, মা। এখন সজলের পেছনে অনেক টাকা দরকার। বিয়ে-থা করলেই তো হবে না? তাতে সংসারে খরচের বোঝা আরও বাড়বে। এ অবস্থায় সংসারের ভার আর তো বাড়াতে পারি না।'

বিনতাদেবী এ নিয়ে বহুবার নরেনকে বিয়ের কথা বলেছেন। দু-তিনটে পাত্রীর সন্ধানও পেয়েছিলেন। কিন্তু নরেনের সেই এক কথা—'ওসব ভাববার এখনও সময় আসেনি।' এ নিয়ে তার সঙ্গে মায়ের দু-একবার কথা কাটাকাটিও হয়েছে। কিন্তু নরেনকে কিছুতেই রাজী করানো যায়নি।

আজও নরেন তাঁর কথা ওভাবে এড়িয়ে যাওয়ায় তিনি একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—'ঠিক আছে, যা ভাল বুঝিস তাই কর্। আমি মরি, তারপর তুই বিয়ে-থা কর—সংসারী হ।'

নরেন মায়ের মনের অবস্থা বুঝে আর কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

সকল মানুষের ভালবাসা, নীতিবোধ আর কর্তব্যজ্ঞান যদি এক হত তাহলে এই সুন্দর পৃথিবীর মানুষগুলোও সুন্দর হত। কিন্তু এখানে কেউ নিজের স্বার্থের লোভে নিজের ভাইকে খুন করে—কেউ উপকারীর উপকার স্বীকার না করে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। আবার কেউ অন্যের স্বার্থে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে নিজের জীবনকে পরের জন্য বিলিয়ে দেয়। মানুষে মানুষে এখানেই প্রভেদ। যে নরেন নিজের জীবনের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে সজলকে মানুষ করে তুলল, নিজের সুখভোগ বিসর্জন দিয়ে যাকে ডাক্তার হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলল—সেই সজল কিন্তু আস্তে আস্তে তার প্রাথমিক কর্তব্যবোধকে হারিয়ে এক শেখানো তথাকথিত বৃহত্তর আদর্শের পেছনে অন্ধের ন্যায় এগিয়ে চলল।

কিছুদিন থেকে সজলের চাল-চলন নরেনের কাছে ভাল ঠেকছিল

না। সে আজকাল প্রায়ই বেশ রাত করে বাড়ি ফেরে। রাত জাগে বটে—তবে নরেন লক্ষ্য করেছে, কলেজের বইপত্তর না পড়ে সে যেন কী সব অন্য বই নিয়ে রাত কাটায়।

এ পাড়ার বরেন মুখার্জি পাক্কা পলিটিশিয়ান সজলকে আজকাল প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা যায়। পার্টির বেশ কিছু ছেলে—যাদের আগে কোনদিনই নরেন তাদের বাড়ি আসতে দেখেনি—আজকাল তারা প্রায়ই সজলের কাছে আসে। তাদের সঙ্গে নানা ধরনের রাজনৈতিক আলোচনা হয়। নরেনকে দেখলেই সজল যেন তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। সে একদিন সজলকে তার পড়াশোনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল—'পড়াশোনা কেমন চলছে রে সজল? সামনে তো তোর পরীক্ষা।'

'জানি।' বলেই সজল নরেনকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সজলের এ ধরনের সংক্ষিপ্ত উত্তর এবং বলার ভঙ্গি নরেনের মনে কেমন যেন একটা সন্দেহের উদ্রেক করে। সজল এদ্দিন তাকে সমীহ করে আসছে। তাকে কোন প্রশ্ন করলে সে উত্তর দিয়ে অপেক্ষা করত—নরেন আরও কোন প্রশ্ন বা অন্য কিছু বলে কিনা সেটা জানবার জন্য। নরেন অনুমতি দিলে তবে সে চলে যেত। কিন্তু আজকের সজলের চলে যাওয়ার ধরনটা দেখে তার মনে হল, সজল আজ যেন বোঝাতে চাচ্ছে নিজের ভাল-মন্দ বোঝবার যথেষ্ট বয়েস তার হয়েছে। তা নিয়ে অন্যের মাথা ঘামাবার আর যেন প্রয়োজন নেই।

নরেন ভাবল সজল এভাবে চললে তার ভবিষ্যত অন্ধকার। তীরে এসে তরী ডুবে যাবে—এটা যেন নরেন ভাবতেই পারে না। তাই আবার একদিন সজলকে ডেকে তার পড়াশুনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল—'তোর সামনে পরীক্ষা। ওসব রাজনীতি নিয়ে এখন অত মাতামাতি করিস নে। আগে পড়াশোনা শেষ হোক। তারপর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার অনেক সময় পাবি।'

সজল কিন্তু নরেনের মুখের ওপরই বলল—'এসব ব্যাপার নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বলতো কাকা? আমি কি এখনও ছোট

আছি ? আমার ভাল-মন্দ বোঝবার ক্ষমতা আমার এখন হয়েছে।'

সজলের উত্তর শুনে নরেনের বুকের ভেতর কেমন যেন একটা লোহার শাবলের ঘা পড়ল। সজল তার মুখের ওপর এমন একটা কথা বলতে পারবে এটা সে কোনদিন ভাবতেও পারেনি। কিন্তু যে সজলকে সে নিজের হাতে তৈরি করেছে, সে এভাবে বিপথে যাবে সেটা সে কিছুতেই হতে দেবে না। সে ঠিক করল সজলকে এ পথ থেকে সে ফিরিয়ে আনবেই।

নরেন রাজনীতি বোঝে না। পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে নিজের 'সংসার নীতি' নিয়ে সে এত ব্যস্ত ছিল যে 'রাজনীতি' নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ তার ছিল না। আর বর্তমান রাজনীতির নোংরামি দেখে এসবের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনাও তার ছিল না।

পাড়ার বরেন মুখার্জিকে সে চেনে। নরেন জেনেছে বরেন মুখার্জিই সজলকে রাজনীতির পথে নামিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে তাই একবার দেখা করে সজলকে ঐ পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা সে করবে। বরেন মুখার্জির সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় থাকলেও মৌখিক তেমন আলাপ ছিল না। কিন্তু আজ নিজের তাগিদেই নরেনকে বরেনবাবুর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে হল। বরেনবাবুর বাড়িতে সজলের আজকাল খুব যাওয়া-আসা। নরেন বুঝতে পেরেছে ওদের পার্টির সঙ্গে সজল জড়িয়ে পড়েছে। কাজেই একমাত্র বরেন মুখার্জিই সজলকে তার পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে দিতে পারেন।

সেদিন রবিবার। নরেনের অফিস বন্ধ। সকালের দিকেই সে বরেনবাবুর বাড়ি এসে কলিংবেল টিপল। বরেনবাবু বাড়িতেই ছিলেন। দরজা খুলে নরেনকে দেখে একটু হেসে বললেন—'কী ব্যাপার, নরেনবাবু ? এত সকালে ?'

নরেন সিঁড়ির একধাপ উঠে বলল—'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। যদি একটু সময় দিতে পারেন তো, বলি।' নরেন উত্তরের

অপেক্ষায় বরেনবাবুর দিকে তাকাল।

বরেনবাবু একটু কী যেন ভেবে বললেন—'আসুন। ভেতরে আসুন।' তারপর নরেনকে নিয়ে বসার ঘরে দুজনে মুখোমুখি দুটো সোফায় বসলেন। এরপর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন—'বলুন, কী বলতে চান।'

নরেন কীভাবে কথাটা শুরু করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তাই একটু ভেবে বলল—'আপনি তো জানেন বরেনবাবু, সজলকে আমি কীভাবে লেখাপড়া শেখাচ্ছি। নিজের দিকে কখনও তাকাইনি। সেই সজল আজ যদি নিজের খামখেয়ালিতে পড়াশোনা বাদ দিয়ে এখন রাজনীতি নিয়ে পড়ে থাকে, আমার এতদিনের আশাকে আমি যদি বাস্তবায়িত করতে না পারি—তাহলে আমার মানসিক অবস্থা যে কী হতে পারে সে তো আপনি সহজেই বুঝতে পারেন। আপনি বিচক্ষণ লোক—তার দাদার মতো। আপনার কথা সে শুনবে। একমাত্র আপনিই তাকে এ অবস্থায় শুধরে দিতে পারেন।'

নরেনের কথায় বরেনবাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—'সজল পড়াশুনা বাদ দিয়েছে এরকম কিছু তো আমি শুনিনি। তবে ইদানীং একটু রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে—শুনেছি আমাদের পার্টিরও নাকি মেম্বারশিপ নিয়েছে। তাতে পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক কী থাকতে পারে? আজকাল পড়াশোনার সঙ্গে কত ছেলেই তো রাজনীতি করে। আপনার আমার যুগ চলে গেছে। এখন মানুষের জীবনে অনেক সমস্যা। প্রথম থেকেই তার সঙ্গে পরিচিতি না ঘটলে—তার সমাধানের পথ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করলে—হঠাৎ বাস্তবের মুখোমুখি হলে সে যে দিশেহারা হয়ে পড়বে।'

নরেন এতক্ষণ চুপচাপ বরেনবাবুর কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার সে বলল—'আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তবু বলব—সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য নিজেকে প্রথমে তৈরি করতে

হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন না করে কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সজলকে আপনি এ কথা বোঝান। ও ডাক্তারি পাশ করুক। তারপর ওকে দেশের কথা ভাবতে বলুন।'

বরেনবাবু নরেনের শেষের কথাটায় যেন একটু বিরক্তি বোধ করলেন। সে ভাবটা প্রকাশ না করে তিনি বললেন—'দেশের সামনে এখন বহু সমস্যা। দেশের যুব সম্প্রদায় যদি এ সময় এগিয়ে না আসে তাহলে দেশকে বাঁচান যাবে না। এটা এখন প্রত্যেকটি যুবকের কর্তব্য।'

নরেন ক্রমশ বরেন মুখার্জির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে। এটা সে চায়নি। তবু বরেনবাবুর কথার জবাব সে না দিয়ে পারল না। সে বলল—'দেখুন বরেনবাবু, রাজনীতি আমি বুঝি না—আর করিও না। তবু নিজের সামান্য বুদ্ধিতে যা বুঝি সেটা হল বৃহত্তর কর্তব্যের বোঝা কাঁধে নেওয়ার আগে প্রত্যেক যুবককে পরিবারের প্রতি নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। সসীমকে বাদ দিয়ে অসীমকে চিন্তা করা যায় না। ওকে আমরা কীভাবে বড় করেছি—লেখাপড়া শেখাচ্ছি—এটা বুঝতে পেরে পড়াশুনায় অবহেলা না করে বরং পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করে আমাদের প্রতি সামান্যতম কর্তব্যটুকু যদি ও করতে পারে, তাহলেই বুঝব দেশের প্রতি বৃহত্তর কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য নিজেকে তৈরি করতে পেরেছে।'

বরেনবাবু দেখলেন নরেনের সঙ্গে যুক্তি-তর্কের লড়াইয়ে জেতা কঠিন। তাই সেদিকে না গিয়ে তিনি বললেন—'আমি আপনার কথা নিশ্চয়ই সজলকে বলব। তবে বুঝতেই তো পারছেন। আজকালকার ছেলে। আমার কথাও যে সে কতটা শুনবে তা বলা মুশকিল।'

নরেন আর কিছু বলল না। সোফা থেকে উঠে বরেনবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল।

বেশ কিছুদিন গেল। কিন্তু সজলের মধ্যে কোন পরিবর্তন তার নজরে এল না। বরেনবাবু সজলকে এই ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন কিনা নরেন তা বুঝতে পারল না। সে যেমনি চলছিল তেমনি চলতে লাগল। সজল নিজের ভবিষ্যতকে নিজেই অন্ধকারময় করতে চলেছে। নোংরা রাজনীতির জালে জড়িয়ে সজলের সাফল্যের তরী তীরে এসে ডুবে যাবে নরেন কিছুতেই যেন সেটা সহ্য করতে পারছে না। তার এতদিনের স্বপ্ন, যা রূপায়িত করবার জন্য সে নিজের সুখ আহ্লাদকে বিসর্জন দিয়েছে—কোনদিন নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ পর্যন্ত পায়নি—সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, তাতে বাস্তবের ছোঁয়া লাগবে না—এটা যেন তার কাছে এক বিরাট পরাজয়। এ পরাজয় তার কাছে মৃত্যুর চেয়েও নির্মম।

নরেন স্থির করল সজলকে ডেকে এ ব্যাপারে তার সত্যিকারের মনোভাব কী সেটা পরিষ্কারভাবে সজলের কাছ থেকেই জেনে নেবে।

নরেন অফিস থেকে ফিরে পাড়ায় টিউশনি করতে যায়। সেদিনও গিয়েছিল। টিউশনি সেরে যখন বাড়ি ফিরল রাত তখন প্রায় দশটা। মা বিনতাদেবী এই বৃদ্ধ বয়সেও রাতের রান্না সেরে চুপচাপ ঘরে বসেছিলেন।

নরেন এসে মাকে জিজ্ঞেস করল—'তুমি একা একা বসে আছ মা? সজল এখনও ফেরেনি?'

বিনতাদেবী বললেন—'না রে। সজল তো এখনও ফিরল না। তুই অফিসে যাবার পরই দুটো ছেলে এসেছিল। তাদের সঙ্গে তখনই বেরিয়ে গেল। দুপুরে একবার খেতে এসেছিল। খেয়েই আবার বেরিয়ে গেল। মনে হয় কলেজেও যায়নি। এত রাত হল। এখনও ফিরল না।' বিনতাদেবীর চোখে-মুখে একটু দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল।

মায়ের কথায় নরেন কিছু বলল না। গম্ভীর হয়ে হাত মুখ ধোয়ার জন্য বাথরুমের দিকে চলে গেল।

বাথরুম থেকে ফিরে গম্ভীর গলায় সে মাকে বলল—'আমায় খেতে দাও মা। রাত অনেক হয়েছে।'

নরেনের কথায় বিনতাদেবী মনে মনে বিস্মিত হলেন। নরেন আজ একি বলছে! দিনের বেলা না হলেও প্রতিদিন রাতের বেলা ওরা দুজনে একসঙ্গে বসে খাবে। এটা ওদের প্রায় পনের বছরের অভ্যেস। এর হেরফের কোনদিন হয়নি। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম দেখে তিনি বললেন—'সজল তো এখনও এল না রে? ছেলেটা যে কোথায় যায়? বেশ কয়েকমাস থেকে দেখছি প্রায়ই অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। কোথায় যায় বলতে পারিস?'

এতক্ষণ নিজের রাগটা নরেন নিজের মধ্যেই চেপে রেখেছিল। কিন্তু মায়ের কথায় সে আর সেটাকে চেপে রাখতে পারল না। হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল—'তোমার নাতি এখন লায়েক হয়েছে—সাপের পাঁচ পা দেখেছে। আমি এখন কে? সে এখন দেশ উদ্ধার করতে ব্যস্ত। আমাকে তো উদ্ধার করেছেই এখন দেশ উদ্ধারটা বাকি আছে।' বলেই সে হাতের গামছাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাটের একপাশে গিয়ে দুম করে বসে পড়ল।

বিনতাদেবী সেকেলে মহিলা। অতশত বোঝেন না। তিনি ভয়ে ভয়ে ছেলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—'কী হয়েছে রে, নরেন? সজল কোথায় গিয়েছে?'

নরেনের ক্রোধটা তখনও প্রশমিত হয়নি। সে তখনও রাগে কাঁপছিল। সেই অবস্থায় খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'সে কোথায় যায় সেটা তাকে এলেই জিজ্ঞেস কর। তুমি আমাকে খেতে দাও।' বলেই সে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

নরেন খেতে বসেছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। তখন সজল এসে ঘরে ঢুকল। সজল যে এসেছে নরেন সেটা টের পেয়েছে। কিন্তু সে সজলকে খেতে ডাকল না, বা কোথায় গিয়েছিল তাও জিজ্ঞেস করল না। নিঃশব্দে খেয়ে উঠে এল।

সজল ততক্ষণে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে চলে এসেছে। সে এই

প্রথম দেখল কাকা তাকে ছাড়াই রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছে। নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল সে খুব রেগে আছে। এ অবস্থায় সে-ও যদি কিছু না বলে তাহলে পরিবেশটা থমথমে হয়েই থাকবে। তাই সজল যেন কিছুই হয়নি এরকম একটা ভাব করে নরেনকে জিজ্ঞেস করল—'কী হল কাকা, আজ যে আমাকে ফেলে সকাল সকাল খেয়ে নিলে? এর আগে তো আমার জন্য বসে থাকতে।'

সজলের কথায় মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নরেন আর চেপে রাখতে পারল না। আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে আগুন যেমন সশব্দে জ্বলে ওঠে সজলের কথায় নরেনও তেমনি জ্বলে উঠল—'বসে থাকব! বলি কার জন্য বসে থাকব? নিজের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে যাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, সে কিনা আজ আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এমনি করে ধূলিসাৎ করে দিল?'

সজল তার কাকার রেগে যাওয়ার কারণটা বুঝতে পেরে আরও বিনীত ভাবে বলল—'তুমি মিছিমিছি রাগ করছ, কাকা। সেদিন তোমাকে যা বলেছি তা নিছক ভুল করেই বলেছি।' সজল দেখল তার কাকা বেশ রেগে আছেন। তাঁকে শান্ত করা দরকার। তাই তাঁর কাছে এসে আবার বলল—'তোমার কথার অবাধ্য কি আমি কখনও হয়েছি? তুমি কি ভাবছ পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু পার্টি করে বেড়াব?'

সজলের কথায় নরেনের ক্ষোভ অনেকটা কেটে গেল। সে বলল—'যাক্, এই রাত দুপুরে আর বক্তৃতা করতে হবে না। তোমার নেতাদের মতো ওসব মন ভুলানো বক্তৃতা মাঠে-ময়দানে দিও। তাতে লোকের বাহবা পাবে। এবার যাও দেখিনি—তোমার নিজের খাবারটা খেয়ে তোমার এই বুড়ী ঠাকুরমাটাকে আর আমাকে কৃতার্থ কর।' তারপর একটু থেমে আবার বলল—'আর শোন, একটা কথা বলে রাখি। তোমার পড়াশোনার সব ব্যবস্থাই আমি করে দিয়েছি। এখন সেটাকে তুমি কীভাবে ব্যবহার করবে সেটা

তুমিই জান। তবে আমার মনে হয় ছাত্রাবস্থায় ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা হওয়া উচিত।'

সজল এবার কাকার কথায় একটু মৃদু প্রতিবাদ জানাল—'যুগের পরিবর্তনকে তুমি অস্বীকার করতে পার না, কাকা। তুমি যে যুগের কথা বলছ যখন অধ্যয়নই ছিল ছাত্রের একমাত্র তপস্যা—সেই যুগ আর বর্তমান যুগ এক নয়। এখন ছাত্রদের সামনে অনেক সমস্যা। সেইসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ছাত্রকেই করতে হবে।'

নরেন দেখল বরেণবাবুর বুলিই সজল আওড়ে যাচ্ছে। কাজেই এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সে শুধু বলল—'তোমার সব কথাই বুঝলাম। কিন্তু দু নৌকোয় পা বাড়িয়ে লাভ নেই। তাতে ভরাডুবি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পড়াশোনার সঙ্গে রাজনীতি—সে হয় না। তাতে শিক্ষাবিদও হওয়া যায় না আর রাজনীতিবিদও হওয়া সম্ভব নয়। আগে পড়াশোনা শেষ কর। তারপর রাজনীতি করার অনেক সময় পাবে। তবে মনে রেখ—অতীত মানেই খারাপ আর বর্তমান মানেই ভাল এ মানসিকতার প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। যাক্, আর কথা বাড়িও না। এবার খেয়ে নাও।' বলেই সে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

এই ঘটনার পর সজল বেশ কিছুদিন আবার পড়াশোনার কথা ভাবছে বলে মনে হল। কারণ পার্টির দাদাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলেও কলেজে সে প্রায়ই যায়। বাড়িতে পড়াশোনাও কিছু কিছু করে।

এই সময় হঠাৎ একদিন সমস্ত দেশ উত্তাল হয়ে উঠল। বিতর্কিত রাম-বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হল। দেশের মুসলমান সম্প্রদায় এর তীব্র প্রতিবাদ জানাল। অযোধ্যার রামজন্মভূমির অস্তিত্ব তারা মানতে রাজী নয়। রামমন্দির ধ্বংস করে বাবরের সেনাপতি চারশ বছর আগে হিন্দুদের ধর্মে আঘাত হেনে সেখানে যে বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিল সে সত্যটাকে গোপন রেখে, হিন্দুরা তাদের মসজিদ ধ্বংস করল—এই ধরনের প্রচারে তারা নেমে পড়ল। ফলে দেশের

সর্বত্রই আবার ছড়িয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িকতার আগুন। হত্যা, লুণ্ঠন আর অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে আবার দাঙ্গা কবলিত করে তুলল।

কলকাতা তা থেকে বাদ পড়ল না। প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলি 'গেল গেল—গেল আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গেল—গেল আমাদের এতদিনকার ঐতিহ্য' বলে চিৎকার শুরু করে দিল। সরকার তৎপর। ১৪৪ ধারা চালু হল, জারি হল কারফিউ। চলল টিয়ার গ্যাস, লাঠি, গুলি। কিন্তু যা ঘটার তা ঘটে গেল। তারপর শুরু হল শান্তি মিছিল—সংহতি সভা আরও কত কী। দুই সম্প্রদায়ে খুনোখুনি হল। তারপর তারাই আবার বের করল শান্তি মিছিল।

সজলরা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। শান্তির দূত হয়ে তারা ঘুরে বেড়ালো পাড়ায় পাড়ায়। বাড়িতে এসে দুটো মুখে দিয়ে আবার তারা বেরিয়ে পড়ে প্রচার অভিযানে।

নরেন দেখল সজলকে তো এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কখন কী ঘটে যাবে—এখানে-সেখানে যা টেনশন কিছুই বলা যায় না।

একদিন সন্ধ্যায় সজল ঘরে ফিরলে নরেন তাকে ধরল—'এভাবে যখন তখন, যেখানে-সেখানে এই পরিস্থিতির মধ্যে তোমার ঘুরে বেড়ানো ঠিক হচ্ছে না সজল। তুমি এ সময় ঘর থেকে একদম বের হবে না।'

সজলের চোখে মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে। সে কাকাকে বলল—'তুমি কী বলছ কাকা? দেশের এই অবস্থায় সভা-সমিতির মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে এই সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদের দূর করতেই হবে। তা না হলে দেশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

নরেন সজলের কথার উত্তরে বলে—'সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই চায় সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক। কিন্তু তুমি কি মনে কর এভাবে সাম্প্রদায়িকতা দূর করা যাবে? আমি বলছি যাবে না। কারণ এই সাম্প্রদায়িতার উৎস কোথায়, তা নিয়ে তোমরা কেউ

ভাবছ না। আর ভাবার চেষ্টাও করছ না। তুষের আগুনে ছাই চাপা দিয়ে তুষের আগুন নেভানো যায় না। তোমরা সাম্প্রদায়িকতার আগুনে সেই রকম ছাই চাপা দিতে চাচ্ছ। তাতে সে আগুন সাময়িক চাপা থাকলেও তাকে চিরতরে নেভাতে পারবে না। সত্যিই কি আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই? তাই যদি চাইতাম, তাহলে ভারত বিভক্ত হওয়ার আগে সেটা আমরা চাইনি কেন? তখন সম্পূর্ণ ধর্মের ভিত্তিতে আমরা দেশকে দু'ভাগ করলাম। তখন তো আমরা বলিনি যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আমরা অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র চাই। সেখানে তো তাহলে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় ধর্মের কোন প্রভাব থাকত না। কারণ সেকুলার চিন্তা মানেই অধ্যাত্মবাদ বা ধর্ম-সংক্রান্ত ভাবনার বিরোধী চিন্তা। একজন যথার্থ সেকুলার রাষ্ট্রনায়ক কখনই হিন্দু তোষণ বা মুসলিম তোষণ করবে না। সেই চিন্তা তখন তাদের মাথায় এল না কেন? তাহলে আমাদের মতো এ রকম কোটি কোটি মানুষকে নিজের বাপ-ঠাকুরদার ভিটেমাটি ছেড়ে, আত্মীয়স্বজনকে হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচাতে হত না। এখন তোমরা সেকুলারিজম, ডেমোক্রাসি, কমিউন্যালিজম, মিউম্যানিজম এই সব বড় বড় ইংরেছি বুলি আওড়াচ্ছ?'

নরেন যখন এসব কথা বলে সজলকে বোঝাতে চাইছিল সেই সময় কখন যেন বরেন মুখার্জি তাদের খোলা দরজা দিয়ে নরেনের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিলেন। নরেন বা সজল কেউই তা লক্ষ্য করেনি।

নরেনের কথা শুনে এবার বরেনবাবু এগিয়ে এসে তার কথার জবাবে বললেন—'আপনি ঠিকই বলেছেন, নরেনবাবু। তখন হয়তো বিশেষ কোন কারণের জন্য সেটা সম্ভব হয়নি। তা করতে হলে আমাদের স্বাধীনতা হয়তো আরও বিশ বছর পিছিয়ে যেত।' তিনি এসে নরেনের পাশে বসলেন।

নরেন একটু সরে বসে বরেন মুখার্জির ব্যক্তব্য মেনে নিয়েই

বলল—'বেশ, তাই যদি হয় তাহলে আমাদের ভারতবর্ষ—যাকে সম্পূর্ণ ধর্মের ভিত্তিতে আমরা ছুরি মেরে দু-ভাগ করে ফেললাম—Two Nation Theory-তে দুটো আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া হল—সেখানে একটি রাষ্ট্র হল ধর্মীয় রাষ্ট্র আর একটি হল ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র—এটা কোন্ যুক্তি দিয়ে আপনারা আমাকে বোঝাতে পারবেন? আর তাদের সেই ভুলের মাশুল দিতে হল আমাদের মতো কোটি কোটি মানুষকে। শুভবুদ্ধি ও বিবেক-সম্পন্ন প্রতিটি মানুষই ধর্মের নিষ্ঠুর উগ্রতাকে মনুষ্যত্বের চরম অপমান ও বিপর্যয় বলে মনে করে। তাই বলে সাম্প্রদায়িকতার বলি হয়ে সব কিছু হারিয়ে এখন ধর্মনিরপেক্ষ বলে নিজেদের মনে করতে হলে অন্য মানসিকতার ভেতর দিয়ে আমাদের নেতাদের তৈরি করতে হবে। বর্তমান ভারতের কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা কি বুকে হাত রেখে একথা বলতে পারবেন—তাঁরা সত্যি-সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ? নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের দোহাই পেড়ে তাঁরা কি মানুষকে তোয়াজ করেন না? কোনও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের জন্য তাঁরা যখন ধর্মীয় নেতাদের দ্বারস্থ হন তখনই তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে যায়। সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে যখন তারা মুসলিম তোষণের অজুহাতে মুসলিম মৌলবাদকে সন্তুষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করেন না তখন সেই মুসলিম মৌলবাদ প্রীতিকে কিছুতেই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নীতি বলে আপনারা মানলেও আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। কাজেই এই রাজনৈতিক সমাজ কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে নেতারা আজ যতই 'মুসলিম গেল, মুসলিম গেল' বলে চিৎকার করুন না কেন তাতে লোকের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করা যাবে না।'

সজল এতক্ষণ তার কাকার কথা শুনে যাচ্ছিল। কোন প্রত্যুত্তর করেনি। এবার বলল—'আমাদের যে করেই হোক এই সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে দেশকে বাঁচাতেই হবে। এর বিষময়

ফল কী তা জনসাধারণের কাছে পেঁছে দিতে হবে। তা না হলে সাম্প্রদায়িকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাতে জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে আমরা যদি এর বিরুদ্ধে লড়তে না পারি, তাহলে দেশ আরও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমরা কিছুতেই তাহলে দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করতে পারব না।'

বরেন মুখার্জি রাজনীতি করেন। প্রথম দিনের কথাবার্তায় কিছুটা আঁচ করতে পারলেও নরেন যে এতটা গভীরে চিন্তা করতে পারে তা তিনি সেদিন বুঝতে পারেননি। আজ নরেনের কথা শুনে তিনি বুঝলেন নিজেদের সাজানো কথার বুলি আওড়িয়ে একে ভোলানো যাবে না। তাই তিনি সজলের কথার জের টেনেই বললেন—'নরেনবাবু, সজল কিন্তু ঠিকই বলেছে। আজকের দিনে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসনকে মেনে চলা দরকার। আর সেই অনুশাসন মানতে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে তাতে যেন অন্য ধর্মের অনুশাসন কিছুতেই বিঘ্নিত না হয়। এ ব্যাপারে অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তাই আজ আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।'

নরেন আজ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। তার নিজের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে সে যেন আজ উজাড় করে দিতে চায়। তাই বরেন মুখার্জির কথার তীব্র প্রতিবাদ করে সে বলল—'অন্য ধর্মের অনুশাসন তো আমরা কখনই বিঘ্নিত করতে চাই না। কিন্তু যখন দেখি আমাদের পাশের রাষ্ট্রে আমার হিন্দু ধর্মের অনুশাসন বিঘ্নিত হচেছ—শত শত হিন্দু মন্দির ধূলিসাৎ করা হচ্ছে—অথচ সে ব্যাপারে আমার ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের এতটুকু প্রতিবাদ নেই —তখন যদি ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা তার প্রতিবাদস্বরূপ কিছু করে বসে, তখন তো তাদের দোষ দেওয়া যায় না। দেশের নেতারা যদি ধর্মের আবেগকে ভোটের কাজে লাগিয়ে নিজেদের গদি বহাল রাখতে এতটুকু দ্বিধাবোধ না করেন, তাহলে ধর্ম-সংগঠনগুলো

নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য কিছু একটা করে বসলেই তখন 'গেল, গেল' রব ওঠে কেন? একটু ভেবে দেখুন—আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারাই পরোক্ষভাবে দেশের সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। তা না হলে ধর্মনিরপেক্ষ দেশে আমরা কেন মুসলমান প্রধান এলাকায় ভোটের সময় মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাই? হিন্দু প্রার্থী দাঁড় করাতে সাহস পাই না? তার কারণ মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করিয়ে তাঁরা মুসলমান ভোটারদের এটাই বোঝাতে চান একমাত্র মুসলমানই মুসলমানদের স্বার্থ দেখবে। তাঁরাই তো সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগকে ভোটের কাজে লাগিয়ে মুসলমানদের চোখে হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা করে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছেন।'

সজল কাকাকে বলল—'এ ব্যাপারে হয়তো অন্য কারণও থাকতে পারে। হয়তো সেই সব এলাকায় উপযুক্ত হিন্দু প্রার্থী থাকে না। কাজেই বাধ্য হয়ে মুসলমান প্রার্থী দিতে হয়।'

নরেন বরেন মুখার্জির দিকে তাকিয়ে সজলের কথার প্রতিবাদ জানাল—'না, ঘটনা সেটা নয়। এক এলাকার উপযুক্ত লোক অন্য এলাকার প্রার্থী হতে পারবেন না—এমন কোন বাধা সংবিধানে নেই। ইচ্ছে করলেই অন্য এলাকার উপযুক্ত হিন্দুকে মুসলমান এলাকায় প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান যায়।' তারপর একটু থেমে আবার বলল—'তাছাড়া দেখুন, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। এখানে আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত—সকলের জন্য একই আইন প্রযুক্ত হওয়া দরকার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? আমরা দেখি কোন কোন ব্যাপারে হিন্দুর জন্য যে আইন, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টির জন্য যখন সংবিধান সংশোধন করে তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয় তখন সেই দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে আমরা নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আশা করতে পারি না?'

আজ নরেন একাই বক্তা। সে দ্বিধাহীন ভাষায় নিজের মনের ক্ষোভকে প্রকাশ করে যাচ্ছে। সজল, এমন কি বরেন মুখার্জি পর্যন্ত তার সেই বক্তব্যের তেমন কোন প্রতিবাদ জানাতে পারছেন না! তাঁরা যেন নির্বাক শ্রোতা।

নরেন আবার বরেন মুখার্জিকে উদ্দেশ করে বলল—'আপনিই বলুন বরেনবাবু, আপনাদের পার্টিতে পার্টিতে এত যে খুনোখুনি হচ্ছে তার জন্য আপনারা কটা মহামিছিল করেছেন? পার্টি-কোন্দলে পড়ে কত মা তার ছেলেকে হারিয়েছেন—কত স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর চিরতরে মুছে দিয়েছে—তার জন্য তো আপনাদের 'গেল গেল' রব তুলতে শুনিনি? তাকে রোধ করার প্রয়াস আপনারা তো কখনই শেখাননি—বরং খুনের বদলে খুন—এই মতবাদেই আপনারা বিশ্বাসী থেকে পরিসংখ্যান দিয়ে লোককে জানিয়েছেন কোন্ দলের লোক অন্য দলের কজনকে খুন করল! সেকুলার রাষ্ট্র যেখানে ধর্মকে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে মনে করে সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতকে নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে মেনে নিয়ে আপনারা এই পার্টিদ্বন্দ্বকে দূর করতে পারছেন না কেন? কোন এক রাজনৈতিক দল যদি অন্য এক রাজনৈতিক দলের লোককে সহ্য করতে না পারে তাহলে কেবলমাত্র মহামিছিল আর সংহতি সভা করলেই সাম্প্রদায়িক সংহতি গড়ে উঠবে এ আশা আমরা করি কী করে? তার জন্য চাই মানসিকতার পরিবর্তন। রাষ্ট্র নেতারা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম'কে কমিউন্যাল আখ্যা দিয়ে আর মুসলমানদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য সংবিধান সংশোধন করে মুসলমান প্রীতি অর্জন করতে পারেন—তাতে তাঁদের ভোটের বাক্স ভারী হলেও দেশের মাটি থেকে তাঁরা কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বীজ নির্মূল করতে পারবেন না।'

নরেনকে বরেন মুখার্জি এর আগে দেখেছেন। অতি সাধারণ এক ছা-পোষা লোক। বিয়ে-থা করেননি। করার সুযোগও পাননি। মা আর ভাইপোকে নিয়েই নিজের জীবনের বেশির

ভাগটাই কাটিয়েছেন। দেশের রাজনীতি বা সমাজনীতি নিয়ে তিনি যে এতটা ভাবতে পারেন এ ধারণা বরেন মুখার্জির মতো দক্ষ রাজনীতিবিদের মনেও কখনও আসেনি। আজ নরেনের কথাগুলো তাঁর দলীয় মতের দিক থেকে গ্রহণীয় বলে মনে না হলেও নীতিগতভাবে তিনি সেগুলো কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন না। এ যেন 'জেনেও যা জানে না'—তারই মতো। তাই নরেনের কথা শেষ হলে তিনি বললেন—'আজ আমি চলি, নরেনবাবু। পরে আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হবে।' তারপর সজলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কাল আমাদের 'সংহতি মিছিল' বেরুচ্ছে। আমি বেলা বারটা নাগাদ বেরব।' কথাটা বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সংহতি মিছিলে যাওয়ার কথাই সজলকে তিনি বলতে এসেছিলেন। কিন্তু নরেনের ঐ সব কথা শোনার পর তিনি সজলকে সেটা আর মুখে বলে যেতে পারলেন না। পরোক্ষভাবে জানিয়ে গেলেন।

সজল কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নিল সে-ও যাবে সংহতি মিছিলে। নরেন অফিসে যাওয়ার সময় সজলকে বলে গেল—'কলেজ কামাই কর না কিন্তু। খুব সাবধানে চলবে। বরেনবাবুরা যতই সংহতি মিছিল করুন না কেন বাগে পেলে বর্তমান অবস্থায় তোমাকে কেউ ছেড়ে কথা কইবে না।' বলেই তিনি অফিসে বেরিয়ে গেলেন।

সজল চুপচাপ নরেনের কথা শুনে গেল। নরেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার খানিক বাদেই ঠাকুরমাকে সে বলল—'আমাকে খেতে দাও ঠাম্মা।'

বিনতাদেবী ভাবলেন সজল কলেজ যাবে। তাই তাড়াতাড়ি সজলকে খেতে দিতে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন।

খাওয়া সেরে একটা খাতা হাতে সজল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সেই যে বেরিয়ে গেল আর কোন দিনই বাড়ি ফেরার সুযোগ সে পেল না।

সংহতি মিছিলের শেষে সে তার এক মুসলমান বন্ধু মকবুলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সংহতি মিছিলে মকবুলেরও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মিছিলে সে মকবুলকে দেখতে পায়নি। তাই তার কাছে গিয়েছিল। দেখা করে দুজনেই বাস রাস্তার দিকে আসছিল। সজলকে কিছুটা পথ এগিয়ে দেবার জন্য মকবুলও সজলের সঙ্গে আসছিল। জায়গাটা মুসলমান প্রধান এলাকা। গলিপথ। সবে সন্ধ্যে হয়-হয়। হঠাৎ দুম করে বোমা ফাটার আওয়াজ। নির্জন গলিটা থর-থর করে কেঁপে উঠল। চারদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে গেলে দেখা গেল পাশাপাশি পড়ে আছে দুটো লাশ—একটা সজলের আর একটা মকবুলের—যেন একই বৃন্তে দুটো রক্তাক্ত গোলাপ সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই অকালে ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে।

———